৮৭(৩)
লেখমালা
ড: হরপ্রসাদ মিত্র

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI vide Notification No. TB/74/VI/TB/80 and also Board's letter No. 10367/G dated 24. 11. 75

[প্রথম ভাগ]

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, এম. এ. পি-এইচ. ডি.
প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
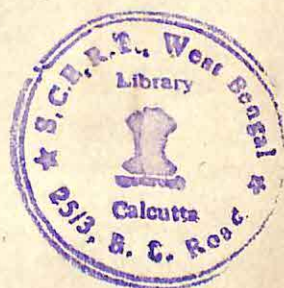
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৭৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
সংশোধিত তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৫
চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৬
পঞ্চম মুদ্রণ, জুলাই, ১৯৭৭
ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৭৮
সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮
অষ্টম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯
নবম মুদ্রণ, জানুয়ারী, ১৯৮০
দশম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮০
একাদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮১
দ্বাদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮২
ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৩

প্রকাশক
শ্রীকৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি.এ.
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
সুব্রত ভট্টাচার্য
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭ লেনিন সরণী, কলিকাতা ১৩

মূল্য : ৪·৫৬ টাকা

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন পৌরুষ-বীর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে তেমনই মানবপ্রেমিক। একদিকে যেমন সমাজ-সংস্কারক, অন্যদিকে বাংলা গদ্য ভাষার জনক। আলোচ্য কাহিনীটিতে লেখক একটি মাতৃভক্ত বালকের বুদ্ধি, বিবেচনা ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন।]

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখাপড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্নে ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি যে উপার্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত হইত না; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার পরিশ্রম করার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে, আমায় লালনপালন করিয়াছেন ; ইঁহার স্নেহ ও যত্নেই, আমি এতবড় হইয়াছি ও এতদিন পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছি ; এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, ইনি এতদিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত ; আমি থাকিতে ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বার বৎসর বয়স হইয়াছে। এ বয়সে পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায় উপস্থিত হইল ; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে কর্ম করিতে আরম্ভ করিল ; তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত, সমুদয় জননীর নিকটে আনিয়া দিত। এই উপার্জন দ্বারা, তাহাদের উভয়ের অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্মস্থানে যাইবার পূর্বে, ঐ বালক গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্মসকল করিয়া জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত ; এবং অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইয়া স্বয়ং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিত ; ইতোমধ্যে জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না ; সুতরাং সমস্ত দিন একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া কষ্টে কালযাপন করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম করিতে পারেন না এবং কেহ নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া সেই বালক, অনেক যত্নে অনেক পরিশ্রমে, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিখাইল যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতি-কালে, সহজ সহজ পুস্তক পড়িয়া স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক এরূপ সুবোধ ও এরূপ মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, তদীয় আচরণ দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অনুশীলনী

১। মাতৃভক্তি গল্পটি সংক্ষেপে লিখ।

২। বৃদ্ধা মাতা অসুস্থ হইয়া পড়িলে পুত্র মনে মনে কি বিবেচনা করিয়াছিল?

৩। মাতা অসুস্থ হইয়া পড়িলে পুত্র কি করিয়াছিল?

৪। প্রতিবেশীরা মাতৃভক্ত পুত্রকে প্রশংসা করিয়াছিল কেন?

৫। শব্দার্থ লিখ :—

উপার্জন; ভরণপোষণ; বিলক্ষণ; গ্রাসাচ্ছাদন; অবয়ব; অকর্মণ্য; প্রতিপালন; সমুদয়; সাধুবাদ; সচরাচর; সন্নিহিত; তদপেক্ষা; বয়ঃক্রম; গৃহসংস্কার; কালযাপন; অবধি; তদীয়; নয়নগোচর; চমৎকৃত; তথাকার।

৬। বাক্য রচনা কর :—

অন্তঃপাতী; ক্রমে ক্রমে; সচরাচর; আন্তরিক; সবিশেষ; অকর্মণ্য; শয্যাগত; উদ্বৃত্ত; লালন পালন; একাকিনী; অনায়াসে; স্বচ্ছন্দে; কালক্ষেপ; প্রীত; মুক্তকণ্ঠে; অনাহারে; আক্রান্ত।

৭। সাধু গদ্যে লিখ :—

(ক) লেখাপড়া না শিখিলে............বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল।

(খ) জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ............আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল।

(গ) এই বালক এরূপ সুবোধ............সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

৮। একার্থক শব্দ লিখ :—

নারী; উপার্জন; পুত্র; মূর্খ; দুঃখ; নিমিত্ত; যত্ন; বিলক্ষণ; জননী; অবয়ব; সঞ্চয়; ক্লেশ; স্নেহ; অধিক; অবশ্যই; সুবোধ; সন্নিহিত; সমুদয়; আহার; স্বয়ং; আবশ্যক; শয্যা; অল্প; অবধি; আচরণ; সচরাচর।

৯। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি পাঁচ বার করিয়া লিখ ও বানান ঠিক কর :—

সঞ্চয়; বিলক্ষণ; ভরণপোষণ; অকর্মণ্য; অন্তঃপাতী; উদ্বৃত্ত; একাকিনী; স্বচ্ছন্দে; দ্বাদশ; প্রীত; দুঃখ; স্বয়ং; শয্যা; আচরণ; তদ্দ্বারা; পীড়িত।

১০। লিঙ্গান্তর কর :—

নারী; একাকিনী; দরিদ্র; অধ্যক্ষ; বৃদ্ধ; পুত্র; জননী; বালক; অল্পবয়স্ক; প্রতিবেশী।

১১। সংসারে মা ও ছেলের সম্পর্ক সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে নিবিড়। এই ভাব অবলম্বন করিয়া 'মা ও ছেলে'—এই বিষয়ে ৫টি বাক্য রচনা কর।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রচনাংশটিতে বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রজীবনেই বিদ্যাসাগরের স্মরণশক্তি, অধ্যবসায় ও বিদ্যানুরাগের আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। অল্প বয়স হইতেই তিনি পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই ছাত্র-জীবন গঠনে পিতা ঠাকুরদাসের প্রভাব সমধিক ছিল।]

নয় বৎসর বয়সের সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন।

ইতঃপূর্বে তাঁহার সংস্কৃত পাঠের সূচনা হয় নাই। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে তাঁহার শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট বালক হইলেন। হালিসহরের অনতিদূরবর্তী কুমারহট্ট পল্লী-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপর ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপনার ভার ছিল। তিনি বিশিষ্টরূপ আগ্রহসহকারে বালক-গণকে শিক্ষা দিতেন, এবং শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ছাত্রগণকে পুত্রবৎ স্নেহসহকারে শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের স্মরণশক্তি, অধ্যবসায় ও বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের

চক্ষে দেখিতেন। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয়মাস পরে যে পরীক্ষা হয় ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

পিতা প্রতিদিন বেলা নয়টার সময়ে বড়বাজারের বাসা হইতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পটলডাঙ্গায় কলেজ-বাটীতে পোঁছাইয়া দিতেন এবং বেলা চারিটার সময় নিজে আসিয়া বালককে বাসায় লইয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার উপরে স্নেহসহকারে দৃষ্টি রাখিবার জন্য লোক থাকিত এবং পিতা নিজে তাঁহাকে পথে যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র অল্পবয়সে মন্দ বালকের সঙ্গলাভের সুযোগ পান নাই। অনেক কোমলমতি, সরলচিত্ত ও বুদ্ধিমান বালক অসৎসঙ্গে পড়িয়া সর্বদাই বিনষ্ট হয়। উত্তরকালে সুশিক্ষা ও সৎচরিত্র লাভে বঞ্চিত হইয়া আপনার ও আত্মীয়গণের সর্বনাশ সাধন করে। বিশেষতঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় ধর্মশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও পুত্রবৎসল পিতার অভাবে বর্তমান বঙ্গসন্তান দুর্নীতি, দুরাচার ও কুশিক্ষার ঘৃণিত পথে বিচরণ করিয়া গৃহের ও দেশের সমূহ অকল্যাণ সাধন করিতেছে।

ক্রমে ঠাকুরদাস যখন বুঝিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র একাকী পথে যাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং একাকী গেলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, তখন তাঁহাকে একাকী যাইতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন ছিলেন। বালক যখন পথে একাকী ছাতা মাথায় দিয়া পড়িতে যাইতেন, তখন দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইত যেন পথে একটি ছাতাই যাইতেছে—তাহার মধ্যে কেহ আছে বলিয়া মনে হইত না।

কলেজে প্রবেশের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতেন। একটি কথা এদিক ওদিক হইলে আর নিস্তার থাকিত না। যাহা পড়িতেন তাহা অবিকল শুনাইতে হইত। ভ্রমবশতঃ একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইলে ঠাকুরদাস অমনি ধরিতেন। ঠাকুরদাস এরূপভাবে বালকের পাঠ লইতেন যে তদ্দর্শনে ঈশ্বর-চন্দ্রের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, পিতা ব্যাকরণে তর্কবাগীশ মহাশয়ের সমান পণ্ডিত। ফলতঃ পিতা পুত্রের পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁহার বয়সের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। সে পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে, পিতার নিকট অত্যধিক নিগ্রহ

ভোগ করিতে হইত। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কখনও কখনও তিনি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পিতা রাত্রিতে কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতেন যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে আর তাঁহার অব্যাহতি থাকিত না। ঈশ্বরচন্দ্র নিদ্রার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক সময় চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেন। ইহার পর ঠাকুরদাস শেষরাত্রিতে বালকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও উদ্ভট কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন।

অপরদিকে শিক্ষক তর্কবাগীশ মহাশয়ও বালকের অত্যাশ্চর্য মেধা দর্শনে বিশেষ যত্নের সহিত বিবিধ বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে শিখাইতেন। তিনি তিন বৎসরকাল এই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠ করেন। দুই বৎসরে পরীক্ষায় সর্বাপেক্ষা উত্তম ফল লাভ করিয়াছিলেন। একবার উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়াও আশানুরূপ পুরস্কার না পাইয়া বিদ্যালয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। তিনি যখন যাহা ধরিতেন, তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে বিরত করিতে পারিত না। জেদের বশবর্তী হইয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া সার্বভৌমের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করা স্থির করেন। সহজে কেহই তাঁহাকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তর্কবাগীশ মহাশয়ের স্নেহানুরোধে বাধ্য হইয়া সার্বভৌমের টোলে পড়ার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং পিতার অভিপ্রায়মত কলেজেই পূর্ববৎ পড়িতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন গঠনে পিতা ঠাকুরদাসের প্রভাব কতখানি ছিল?

৩। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনে পরিশ্রম করার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লিখ।

৪। অর্থ লিখ :— প্রবিষ্ট, প্রতিপত্তি, উত্তরকালে, ইতঃপূর্বে, পুত্রবৎসল, ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন, ব্যুৎপত্তি, বীতশ্রদ্ধ, পারদর্শিতা, অনতিদূরবর্তী, অধ্যাপনা, অধ্যবসায়, অনুরাগ, বৃত্তি, নিগ্রহ, বহুবিধ, জ্ঞাতব্য, বিবিধ, আশানুরূপ, পূর্ববৎ, অভিপ্রায়মত।

৫। টীকা লিখ :— তর্কবাগীশ মহাশয়; সার্বভৌমের টোল; উদ্ভট কবিতা।

৬। বাক্য রচনা কর :— আগ্রহ সহকারে; স্নেহ সহকারে; প্রতিপত্তি; স্মরণশক্তি; কোমলমতি; সরলচিত্ত; সৎচরিত্র; ধর্মশীল; কর্তব্যপরায়ণ; উত্তরকালে; দুরাচার; নিস্তার; অবিকল; ভ্রমবশতঃ; বিস্মৃত; দৃঢ়বিশ্বাস; অব্যাহতি; বশবর্তী; বিচলিত; স্নেহানুরোধে।

৭। প্রতি জোড় শব্দ হইতে শুদ্ধ বানানের শব্দটি লিখ :—

ব্যাকরন ব্যাকরণ; শ্রেণী শ্রেনী; সূচনা সুচনা; পারদশীতা পারদর্শিতা; ব্যুৎপত্তি বুৎপত্তি; রক্ষণাবেক্ষণ রক্ষনাবেক্ষন; দুনীতি দুণীতি; ঘৃনিত ঘৃণিত; বিচরন বিচরণ; অকল্যাণ অকল্যান; যন্ত্রণা যন্ত্রনা; পরিত্রান পরিত্রাণ।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— ক্ষুদ্রাবয়ব; তদ্দর্শনে; সংস্কৃত; বিদ্যালয়; সর্বোৎকৃষ্ট; বাগীশ; ব্যুৎপত্তি; অত্যন্ত; দৃষ্টি; রক্ষণাবেক্ষণ; যাতায়াত; দুরাচার; দুনীতি; অত্যধিক; অত্যাশ্চর্য; সর্বাপেক্ষা; পরীক্ষা; আশানুরূপ।
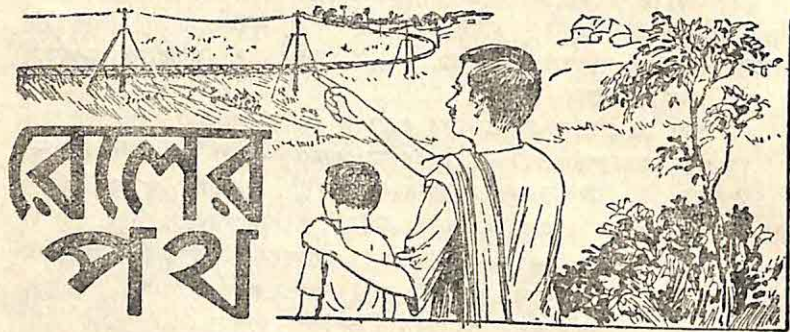
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বৃহৎ উপন্যাস ও ছোটগল্প রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি শৈশব-স্মৃতিতে ভরপুর। আলোচ্য অংশটি উপন্যাসের 'আম আঁটির ভেঁপু' পর্বের শিশু-সংস্করণ হইতে গৃহীত। অতি-পরিচিত ও সীমাবদ্ধ পল্লী-পরিবেশের মধ্যে স্বপ্নমুগ্ধ ও কল্পনাপ্রবণ একটি শিশু-মন কিভাবে দূরের হাতছানিতে সাড়া দেয়, আলোচ্য 'রেলের পথ' রচনাটিতে তারই নিদর্শন পাওয়া যায়।]

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা পাবে—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চাল্‌তেতলা, নদীর ধার, বড় জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে বৈকালে দিদির সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন হইতেই উৎসাহে তার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল। দিন গণিতে গণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু—দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে

মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায়, সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে? তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চল না? আমরা রেল-লাইন পেরিয়ে যাব এখন।

সেবার তাদের রাঙী-গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গায় দুই-তিন দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—এক কাজ করবি অপু, চল্ যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা, সে যে অনেক দূর! সেখানে কি করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি? কে বলেছে তোকে? ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো!

অপু বলিল—কাছে হলে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় যদি, চল্ গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, বোধ হয় যাওয়া হবে না! কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসবো কি করে?

তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল; লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই, গিয়ে দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন। হয়তো রেলের গাড়ি দেখা যাবে এখন। মাকে বলবো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

প্রথম তাহারা একটুখানি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল—কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাইবোনে মাঠ-বিল-জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়—

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়, খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে

ভরা ; এইখানে আসিয়া তাহারা পথ হারাইয়া ফেলিল। কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে ও দুপাশে কেবল ধানক্ষেত, জলা আর বেতঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে পা পুঁতিয়া যায়। শেষে রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দিদির পরণের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ের তলা হইতে দু-তিনবার কাঁটা টানিয়া-টানিয়া বাহির করিতে হইল। শেষে রেল-রাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফিরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না। জলা ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহুকষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল, তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবে সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছুদূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো একটা উঁচুমতো রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে-বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। শাদা-শাদা লোহার খুঁটির উপর যেন এক সঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা ; যতদূর দেখা যায় ঐ শাদা খুঁটিও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে। তাহার বাবা বলিল—ঐ দ্যাখো খোকা রেলের রাস্তা।

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন?...উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়?...কেন?...মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন?...পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না কেন?...ওগুলোকে তার বলে? তারের মধ্যে সোঁ-সোঁ কিসের শব্দ?...তারে খবর দিতেছে?...কাহারা খবর দিতেছে?...কি করিয়া খবর দেয়?...ওদিকে কি ইষ্টিশান?...এদিকে কি ইষ্টিশান? —কিছুক্ষণ এইভাবে ক্রমাগত প্রশ্ন চলিল।

শেষে অপু বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কি করে দেখবে? সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে, এখনো চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরি।

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কক্‌খনো দেখিনি, হ্যাঁ বাবা?

—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তো তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি করে দেখবে? সেই দুপুর অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে! চল, আসবার দিন দেখাবো। অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে-পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

অনুশীলনী

১। দিদির সঙ্গে অপুর রেলের রাস্তা দেখিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

২। নিজের গ্রামে অপুর দিনগুলি কি ভাবে কাটিত?

৩। বাবার সঙ্গে পথে বাহির হইয়া দূর হইতে রেলের রাস্তা অপু কি রকম দেখিয়াছিল?

৪। বাক্য রচনা কর :—সড়ক, দিন গণা, সতৃষ্ণ দৃষ্টি, মুশকিল, দুপুর অবধি, দায় হওয়া, একদৃষ্টে, এদিক ওদিক, সুবিধাজনক, দূরের কথা, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা, পিঠ বাঁচানো, বিস্ময়ের সহিত, উঁচুমতো, শাদা শাদা, মরিয়া হয়ে, বরাবর, সোঁ সোঁ, ক্রমাগত, ঠায় রোদ্দুরে, জলভরা চোখে, পিছনে পিছনে।

৫। টীকা লিখ :— জলা; হোগলা আর শোলা গাছ; মাঠ-বিল-জলা।

৬। বানান শিখ :— জ্যৈষ্ঠ; দক্ষিণ; বিস্ময়; অনেকক্ষণ; পরণের; কিছুক্ষণ; অবশেষে।

৭। তোমার নিজের যে কোন একটি ভ্রমণ-কাহিনীর বিষয়ে ১০ লাইনের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

৮। সাধু ভাষায় লিখ :—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তো তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি করে দেখবে? সেই দুপুর অবধি বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায় রোদ্দুরে। চল, আসবার দিন দেখাবো।
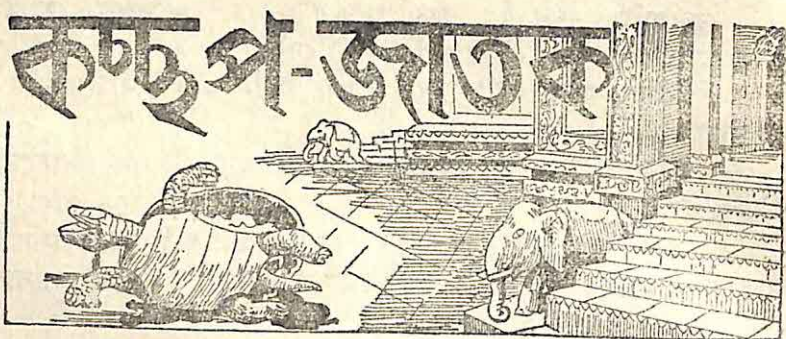
ঈশানচন্দ্র ঘোষ

['জাতক' শব্দটি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত। ইহাতে ভগবান গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত বোঝায়। বৌদ্ধদের মতে, শুধু এক জন্মের কর্মফলে কেহই গৌতম বুদ্ধের মত পরিণত জ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারেন না; নানা জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া পূর্ণজ্ঞানলাভ সম্ভব। বৌদ্ধশাস্ত্রে পরিকল্পিত বুদ্ধদেবের এই নানা জন্ম পরিগ্রহ করাকেই 'বোধিসত্ত্ব' বলা হয়। বুদ্ধদেবের অতীত জন্মবৃত্তান্তমূলক এই জাতক কাহিনীগুলিতে কথাচ্ছলে সদুপদেশ দিবার পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ঈশানচন্দ্র ঘোষ কৃত জাতকের অনুবাদ 'জাতক-মঞ্জরী' হইতে কাহিনীটি গৃহীত। 'কচ্ছপ জাতক' কাহিনীটিতে বাচালতার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজার অন্যতম অমাত্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা বড় বাচাল ছিলেন; তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কেহ কিছু বলিবার অবসর পাইত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতাদোষ দূর করিবার নিমিত্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে কোন সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করিত। দুইটি হংস সেখানে খাদ্যান্বেষণে যাইত। তাহাদের সহিত কচ্ছপের পরিচয় হইল এবং ক্রমে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাহারা একদিন কচ্ছপকে বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, আমাদের

বাসস্থান হিমবন্ত প্রদেশের চিত্রকূটশৈলস্থ কাঞ্চনগুহায়। উহা অতি রমণীয় ; তুমি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাইবে কি?" কচ্ছপ বলিল, "আমি কি করিয়া সেখানে যাইব?" "তুমি যদি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার, কাহাকেও কিছু না বল, তাহা হইলে আমরাই তোমাকে লইয়া যাইব।" "মুখ বন্ধ করিতে পারিব না কেন? তোমরা আমাকে লইয়া চল।" হংসদ্বয় বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি।"

তখন হংসেরা একটি দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে উহার মধ্যভাগ কামড়াইয়া ধরিতে বলিল এবং আপনাদের চঞ্চুদ্বারা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। হংসদ্বয় কচ্ছপকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রাম্য বালকেরা বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, দুইটা হাঁস একটা লাঠি দিয়া একটা কাছিম লইয়া যাইতেছে।"

গ্রাম্য বালকদিগের কথা শুনিয়া কচ্ছপের বলিতে ইচ্ছা হইল, "অরে দুষ্ট বালকগণ, আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তোদের কিরে?" তাহার মনে যখন এই ভাবের উদয় হইল, তখন হংসদ্বয়ের অতি দ্রুতবেগবশতঃ তাহারা বারাণসী নগরস্থ রাজ-ভবনের ঠিক উপরিদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কচ্ছপ যেমন কথা বলিবার উপক্রম করিল, অমনি দণ্ড হইতে তাহার মুখ স্খলিত হইয়া গেল এবং সে রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়িয়া দ্বিধা বিদীর্ণ হইল। ইহাতে রাজভবনে মহা কোলাহল হইল ; সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল 'উঠানে একটা কাছিম পড়িয়া দুই টুকরা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সেখানে গিয়া কচ্ছপটাকে দেখিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এ কচ্ছপটা পড়িয়া গেল কিরূপে?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য এতদিন উপায় প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি। এখন দেখিতেছি, উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই কচ্ছপের সহিত হংসদিগের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা ইহাকে হিমবন্ত প্রদেশে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে দণ্ড কামড়াইয়া ধরিতে বলিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় ইহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়াছিল। তাহার পর কিছু বলিবার ইচ্ছায় এ মুখ সামলাইতে পারে নাই, বলিতে গিয়া দণ্ড ছাড়িয়া দিয়াছে এবং আকাশ হইতে পড়িয়া মারা গিয়াছে।' এই

চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, এবং জিহবাকে সংযত রাখিতে পারে না, তাহাদের এইরূপই দুর্দশা হইয়া থাকে।"

রাজা বুঝিলেন, বোধিসত্ত্ব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি হউন, বা অন্য কেহই হউক, অপরিমিতভাষীদিগের এইরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে রাজা তদবধি রসনা সংযত করিয়া মিতভাষী হইলেন।

অনুশীলনী

১। টীকা রচনা কর :— বোধিসত্ত্ব, জাতক।

২। কচ্ছপ ও হংসদ্বয়ের গল্পটি বল।

৩। বোধিসত্ত্ব কিভাবে রাজাকে মিতভাষী করিয়া তুলিলেন?

৪। 'কচ্ছপ জাতক' কাহিনীটির মধ্যে নিহিত নীতি কথাটি কি?

৫। শব্দার্থ কর :— অমাত্য, বাচালতা, সৌম্য, চক্ষু, কাছিম, স্খলিত, প্রাঙ্গণ, বিদীর্ণ, পরিবৃত, অপরিমিতভাষী, মিতভাষী, বয়ঃপ্রাপ্ত, রমণীয়।

৬। বাক্য রচনা কর :—উপক্রম; স্খলিত; বিদীর্ণ; দ্রুতবেগবশতঃ; মহাকোলাহল; পরিবৃত; অবসর; মুখ সামলানো; মুখর; সংযত।

৭। প্রত্যেকটি শব্দ ৫ বার করিয়া লিখিয়া বানান ঠিক কর :—
বোধিসত্ত্ব; রমণীয়; চীৎকার; মিতভাষী: প্রাঙ্গণ: বিদীর্ণ।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—খাদ্যান্বেষণে; প্রতীক্ষা; দুর্গতি; তদবধি; বয়ঃপ্রাপ্ত।

৯। 'বাচালতা দোষ'—এই বিষয়ে ৫টি বাক্য রচনা কর।

১০। 'মিতভাষী' হইলে কি লাভ হয়—এই বিষয়ে ৫টি বাক্য রচনা কর।

এভারেস্ট অভিযান

বিশ্বপতি চৌধুরী

[হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ একদিকে যেমন সর্বোচ্চ অন্যদিকে তেমনই দুর্গম। বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া বার বার দুঃসাহসী অভিযাত্রিগণ এই পর্বত শৃঙ্গ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে তেনজিং, হাণ্ট ও হিলারীর অভিযান সফল হয়। এভারেস্ট অভিযানের এই কাহিনী নিম্নমুদ্রিত রচনাটিতে লেখক পরিবেশন করিয়াছেন।]

হিমালয়ের অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে উঁচু, তাহার নাম এভারেস্ট। এই শৃঙ্গটির উচ্চতা ঊনত্রিশ হাজার এক শত একচল্লিশ ফুট। অর্থাৎ পাঁচ মাইলেরও কিছু বেশী। এত উচ্চ শৃঙ্গ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

এই শৃঙ্গে আরোহণ করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই শৃঙ্গটির ঊর্ধ্বদেশ চির-তুষারাবৃত। এখানকার বায়ু এত হালকা যে মানুষ নিশ্বাস লইতে পারে না, সেইজন্য নাকের কাছে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক বায়ু সৃষ্টি করিতে হয়। তাহার উপর উঠিবার সময় মাঝে মাঝে তুষার-ঝটিকার উৎপাত আছে। এই তুষার-ঝটিকা একবার বহিতে আরম্ভ করিলে কাহারও নিস্তার নাই। এই ভীষণ ঝটিকা তখন যাহাকে সম্মুখে পাইবে,

তাহারই উপর রাশি রাশি তুষার বর্ষণ করিতে থাকিবে। এই তুষার-রাশির মধ্যে চাপা পড়িয়া মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কিন্তু, এত বিপদ, এত কষ্ট সত্ত্বেও নিভীক গিরিপর্যটকের দল এভারেস্ট-অভিযানে বার বার বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কত ব্যক্তি এই চেষ্টায় প্রাণ দিল, কত ব্যক্তি পথকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ভগ্নশরীর লইয়া ফিরিয়া আসিল, তথাপি চেষ্টার বিরাম নাই। জীবন ইহাদের নিকট তুচ্ছ।

এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা বহুবার হইয়াছে। এই চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ইউরোপের লোক। প্রথম চেষ্টা হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম বারের দলটি পঁচিশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর আবার একবার চেষ্টা হয়। এই দ্বিতীয়-বারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এইবারের অভিযানকারীরা সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিতে পারিয়াছিলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আবার একবার চেষ্টা হয়। এই অভিযানের নায়ক হইলেন ম্যালোরি নামে এক ব্যক্তি। ইনি ইহার পূর্বে আরও কয়েকবার বিভিন্ন দলের সহিত এভারেস্টের চূড়ায় উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এখানকার পথঘাট এবং হাল-চাল তাঁহার অনেকটা জানা ছিল। এইজন্য সকলে তাঁহাকে দলের নায়ক করিয়াছিলেন।

ম্যালোরির দল যাত্রা শুরু করিলেন। সঙ্গে একদল কুলি চলিল। তাহাদের পিঠে বড় বড় বোঝা। এই বোঝাগুলিতে ছিল তাঁবু, খাদ্যদ্রব্য, কম্বল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। সাতাশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঠিয়া ইঁহারা তাঁবু খাটাইলেন। সাতাশ হাজার ফুটের তাঁবু হইতে এভারেস্টের চূড়া মাত্র দুই হাজার ফুট। কিন্তু এই দুই হাজার ফুট উঠাই ভীষণ ব্যাপার। এখানে তুষার-ঝটিকা রাতদিন লাগিয়াই আছে।

স্থির হইল ম্যালোরি ও আরভিন চূড়ায় উঠিবেন, আর অন্য সকলে পঁচিশ হাজার ফুটের তাঁবুতে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

ম্যালোরি ও আরভিন যাত্রা শুরু করিলেন। চূড়ায় পেঁৗছিতে আর বোধ হয় ছয় শত ফুট মাত্র বাকি। এবার তাঁদের জয় সুনিশ্চিত।

ওডেল প্রভৃতি উৎসাহে ও আনন্দে প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠিলেন।

এই ছয় শত ফুট তাঁহারা আর অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ম্যালোরি ও আরভিনের এই যাত্রাই শেষ যাত্রা হইল। এভারেস্টের তুষাররাশির মধ্যে তাঁহাদের দেহ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা গিরিরাজ হিমালয়ই কেবল বলিতে পারেন।

ইহার পর ১৯৩৩।৩৬।৩৯।৫১ সালে যে সকল অভিযান হয় সেগুলিতে ২৮ হাজার ফুটের ঊর্ধ্বে অভিযাত্রীরা উঠিতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালের অভিযানে তেনজিং ও ল্যাম্বোয়ার নামে একজন সুইস ২৮.৫৫০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। তারপর ১৯৫৩ সালে তেনজিং ও নিউজিল্যাণ্ডের হিলারি কর্নেল হাণ্টের নেতৃত্বে অভিযান করিলেন।

এই দলে ১৩ জন ব্রিটিশ অভিযাত্রী ছিল। সঙ্গে ছিল ৩৬৩ জন ভারবাহী কুলি। ২৯ জন দিশারী আগে আগে চলিল।

২৮ হাজার ফুট পর্যন্ত অধিকাংশ অভিযাত্রী উঠিলেন—এখন বাকি থাকিল এক হাজার ফুট। দলের নেতা হাণ্ট সাহেব হিলারী ও তেনজিংকে পাঠাইলেন ঐ এক হাজার ফুট উঠিয়া বহু বৎসরের প্রয়াসকে সফল করিবার জন্য। তেনজিং সহকারী ও দিশারী হইয়া পূর্বে অনেক অভিযানেই সঙ্গী ছিলেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা বহুদিনের।

এভারেস্টের এই অংশে কোথাও পাথর দেখা যায় না। সমস্ত চূড়াটিই কঠিন বরফের আচ্ছাদনে আবৃত। কোথাও পা রাখিবার জায়গা নাই। তাঁহারা কুড়াল দিয়া বরফের গায়ে খাঁজ কাটিয়া পা রাখিবার ধাপ বানাইয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপ এক ধাপে দাঁড়াইয়া আবার কুড়াল চাপাইয়া নূতন ধাপ বানাইতে লাগিলেন—এইভাবে প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহারা অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশ্রামের উপায় নাই, অথচ শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন।

অবশেষে তাঁহারা ২৯শে মে তারিখে এভারেস্টের চূড়ায় উঠিয়া সমগ্র পৃথিবীর পানে সগৌরবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তেনজিং—রাষ্ট্রসংঘ, বৃটেন, ভারত ও নেপালের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিলেন। মানুষের সঙ্গে হিমালয়ের মহাসংগ্রাম শেষ হইল।

তারপর নামিবার পালা। উঠার চেয়ে নামা আরো কঠিন, জয়-

গৌরব দুইজনকে দ্বিগুণবলে বলীয়ান করিল। সুখের বিষয় ঐ গৌরব তাঁহাদের ধীরতা নষ্ট করে নাই। আবার কুড়াল দিয়া তুষার সরাইতে সরাইতে তাঁহারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে নামিতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন নীচের ছাউনীতে নামিয়া আসিলেন তখন কোলাহলে বিরাট হিমালয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সেখানে তো ফুলের মালা ছিল না—সঙ্গীরা নিজ নিজ বাহুর মালা দুইজনের গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপর সমতলে নামিয়া এই বিজয়ী বীরদ্বয় দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, সিজার ও নেপোলিয়নের চেয়ে বোধ হয় অধিক সম্মান লাভ করিয়াছেন।

অনুশীলনী

১। এভারেস্ট-শৃঙ্গের পরিচয় দাও।

২। এভারেস্ট অভিযানের পক্ষে বড় বাধা কি কি?

৩। এভারেস্ট অভিযানের চেষ্টা প্রথম কবে এবং কাহাদের দ্বারা হয়? তাহার পরিণাম কি?

৪। ম্যালোরি ও আরভিনের অভিযানের পরিণাম কি হইল?

৫। তেনজিং কিভাবে এভারেস্টের চূড়ায় উঠিলেন?

৬। দুর্গম পথে এই জাতীয় অভিযানের সার্থকতা কি?

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—

কৃত্রিম, নিস্তার, গিরি পর্যটক, অভিযানকারী, তুষার-ঝটিকা, বাহুর মালা, প্রোথিত, অভিযাত্রী, ভগ্নশরীর, দিগ্‌বিজয়ী, অবসন্ন।

৮। টীকা লিখ :—

রাষ্ট্রসঙ্ঘ; আলেজাণ্ডার; সিজার; নেপোলিয়ান; জাতীয় পতাকা; তুষার ঝটিকা; গিরি পর্যটক; গিরিরাজ হিমালয়।

৯। বাক্য রচনা কর :—

নিজ নিজ; জয়গৌরব; ধীরে ধীরে; করিতে করিতে; দ্বিগুণবলে; মহা-সংগ্রাম; সরাইতে সরাইতে; সগৌরবে; ভারবাহী; কৃত্রিম; রাশি রাশি; নির্ভীক; স্বাভাবিক; তুষারাবৃত; পথকষ্ট; হালচাল; সুনিশ্চিত; তুষার রাশি; অদৃশ্য; দিশারী; ধীরতা।

১০। শুদ্ধ বানানের রূপটি লক্ষ্য কর ও প্রত্যেকটি শব্দ ৫ বার করিয়া লিখ :

দ্বিগুণ; চূড়া; আরোহণ; কৃত্রিম; উৎপাত; সম্পূর্ণ; স্বাভাবিক; ভীষণ; নির্ভীক; সত্ত্বেও; প্রাণ; ব্যক্তি; ব্যর্থ; অভিযান; অভিযাত্রী; প্রাণপণ; বলীয়ান।

১১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

ভয়ঙ্কর; তুষারাবৃত; সম্পূর্ণ; নির্ভীক; আচ্ছাদন।

জলধর সেন

['ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় স্ত্রী-বিয়োগের পর যৌবনে কিছুদিন সংসার ত্যাগ করিয়া শান্তির আশায় হিমালয়ের বিজন বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য রচনাটিতে হিমালয়ের দুর্গম পথ, নিসর্গ সৌন্দর্য, নির্জন মহিমা ইত্যাদি ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

একটু অগ্রসর হ'য়েই সম্মুখে একটা প্রশস্ত দুরারোহ পাহাড় দেখলুম। আগাগোড়া কঠিন বরফরাশিতে আবৃত; যেন বিভূতিভূষিত যোগিশ্রেষ্ঠ; সরল, উন্নত, শুভ্রদেহ, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের যেন অখণ্ড আদর্শ। মস্তক আকাশ স্পর্শ ক'রছে; মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণ তাতে প্রতিফলিত হ'য়ে কিরীটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। নিম্নে স্তূপে স্তূপে বরফ সঞ্চিত হ'য়ে পাদদেশ আবৃত ক'রেছে। আমরা যেন বিস্ময় ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যই তার পদতলে এসে দাঁড়ালুম।

কিন্তু আমাদের এই বিস্ময় ও ভক্তি শীঘ্রই ভয়ে পরিণত হ'লো। শুনলুম, এই উন্নত পাহাড়ের পরপ্রান্তে বদরিকাশ্রম। এই পাহাড় উল্লঙ্ঘন না করলে আমাদের সেই পুণ্যাশ্রম দেখবার অধিকার নেই। কিন্তু এ পাহাড় অতিক্রম করা বড় সহজ কথা নয়। যাত্রার আরম্ভে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম উদ্যমেই যদি এমন একটা বিশাল পর্বত আমার অভীষ্ট সাধনের পথ আটকে এই রকম ভাবে দাঁড়াতো, তবে এই

সন্ন্যাসব্রত—কঠোরতাই যার সাধনার অঙ্গ—তা গ্রহণ করতে সাহস করতুম কি না সন্দেহ।

একে ত ক্রমাগত সোজা উপরের দিকে উঠা, প্রতিপদে পা ভাঙ্গে এবং নিঃশ্বাস আটকে আসে, তার উপর পায়ের নীচে বরফের স্তূপ! যেখানে বরফ একটু গ'লছে, সেখানে যেন বালিরাশির উপর দিয়ে যাচ্ছি। প্রতি পদক্ষেপেই পা ডুবে যাচ্ছে। আবার যেখানে জমাট কঠিন বরফ, সেখানে ভয়ানক পিছল; একটু অসাবধান হয়ে পা ফেললেই আর কি, মুহূর্তমধ্যে ইহজীবনটা ডিঙ্গিয়ে পরলোকের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়।

চ'লতে চ'লতে পায়ের যাতনা ক্রমে অনেকটা কমে এল দেখলুম। আস্তে আস্তে পা দু'খানি অসাড় হ'য়ে পড়লো; তখন সেই তুষার-শীতল স্পর্শ আর তাদের কাতর করতে পারলে না। বেশ বেগের সঙ্গেই চলতে লাগলুম। সময়ে সময়ে খানিকটা বরফ তুলে নিয়ে গোলাকার ক'রে দূরে ছুঁড়ে ফেলি; দেখতে দেখতে তা ধুলোর মত গুঁড়ো হ'য়ে যায়।

পা অবশ হ'য়ে ক্রমে ভারি হ'য়ে এল, তবু প্রাণপণ শক্তিতে এ পথটুকু চলতে লাগলুম। খানিক পরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পেঁছিলুম। বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

এখানে এসে চেয়ে দেখলুম অপর পাশে খানিকটা নীচে কিছু-দূর-বিস্তৃত একটা সমতল ক্ষেত্র। দুই পাশে দুটি অভ্রভেদী পাহাড় ধনুকের মত সেই সমতলভূমিকে কোলে নিয়ে র'য়েছে। অলকানন্দা দূরে দূরে আঁকাবাঁকা দেহে অতি ধীরগতিতে চ'লে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য স্রোত দেখা যাচ্ছে। অনেক স্থানেই জল দেখবার যো নেই। পাতলা বরফগুলি ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে; তাই দেখে স্রোতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। কোথাও বা স্রোতের সম্পর্ক মাত্র নেই, আগাগোড়া জমে গিয়েছে, কেবল নদীগর্ভের নিম্নতায় নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যাচ্ছে। সেই দুগ্ধফেননিভ বহুদূরবিস্তৃত তুষাররাশির উপর অস্তোন্মুখ তপনের লাল রশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে এমন বিচিত্র শোভা হ'য়েছিল যে, বোধ হ'লো সে যেন পৃথিবীর শোভা নয়, সে দৃশ্য অলৌকিক! আমি মনে মনে কল্পনা করলুম, শান্তিহারা অধীর হৃদয়ে ঘুরতে ঘুরতে আজ বুঝি বিধাতার আশীর্বাদে দুঃখকোলাহলময় পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে বরণীয় স্বর্গ-

রাজ্যের দ্বারে উপনীত হয়েছি। ঐ তুষারমণ্ডিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অলকানন্দার শোভাময় উপকূল, আমার কাছে সুরনদী মন্দাকিনীর প্রবালে বাঁধানো সুরম্য তীর বলে বোধ হয়েছিল। চারিদিকে কেমন শান্তি কত পবিত্রতা। দুঃখ, কষ্ট, পথশ্রম সমস্ত ভুলে গেলুম। এই অসীম যন্ত্রণাময় দগ্ধজীবনের গুরুভারও যেন লঘু হয়ে গেল। অদূরে নারায়ণের তুষারমণ্ডিত মন্দির। সমতলভূমির উপর আর একটি ছোট মন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট পাথরের ঘর। নদীর ধারে যেমন বালির ঘর বেঁধে মেয়েরা খেলা করে ; এবং খেলা সাঙ্গ ক'রে তারা বাড়ী চ'লে গেলে যেমন ঘরগুলি সেই নির্জন নদীতীরে পড়ে থাকে, অলকানন্দার তীরে এই শুভ্র সমতল প্রদেশে এই ছোট ঘর ও মন্দির দেখে আমার মনে হলো, বুঝি দেববালারা এসে খেলাচ্ছলে এগুলি তৈয়েরী করেছিল ; বেলা অবসান হওয়ায় খেলা সাঙ্গ ক'রে তারা বাড়ী ফিরে গিয়েছে।

অনুশীলনী

১। উঁচু পাহাড়ে উঠিতে লেখকের কি অসুবিধা হইয়াছিল?
২। দূর হইতে অলকানন্দা নদী কেমন দেখাইতেছিল?
৩। বদরিকাশ্রমের যাত্রাপথটি বর্ণনা কর।
৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—
দুরারোহ, বিভূতিভূষিত, কিরীট, উল্লঙ্ঘন, অভীষ্ট, অভ্রভেদী, তুষার-শীতল, দুগ্ধফেননিভ, সুরম্য, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত, তুষারমণ্ডিত, বহুদূরবিস্তৃত, বরণীয়, অস্তোন্মুখ, অলৌকিক।
৫। ব্যাখ্যা কর :—
(ক) আমরা যেন বিস্ময় ও ভক্তির............পদতলে এসে দাঁড়ালুম।
(খ) বোধ হলো সে যেন............সে দৃশ্য অলৌকিক।
(গ) এই অসীম যন্ত্রণাময়............যেন লঘু হয়ে গেল।
৬। বাক্য রচনা কর :—
আবৃত; আদর্শ; দুরারোহ; পুষ্পাঞ্জলি; উল্লঙ্ঘন; অভীষ্ট; প্রতিপদে, অসাবধান; তুষার-শীতল; প্রাণপণ; বিস্তৃত; অভ্রভেদী; ধীরগতিতে; আগাগোড়া; অস্তোন্মুখ; অলৌকিক; উপনীত; শান্তিহারা; বরণীয়; সুরম্য; পথশ্রম; অসীম; গুরুভার; খেলাচ্ছলে; চলতে চলতে; আঁকাবাঁকা।
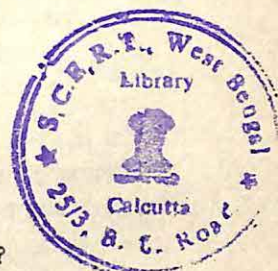
৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

দুরারোহ; উল্লঙ্ঘন; অভীষ্ট; অস্তোন্মুখ; সন্ন্যাস; পুষ্পাঞ্জলি; খেলাচ্ছলে; উন্নত; পুণ্যাশ্রম; ক্রমাগত।

৮। প্রতি জোড়া শব্দের মধ্যে কেবল শুদ্ধ বানানের শব্দটি লিখ :—

অভিষ্ট অভীষ্ট; সন্যাস সন্ন্যাস; প্রানপন প্রাণপণ; অঞ্জলি অঞ্জলী; বরণীয় বরনীয়; স্তুপ স্তূপ; সন্মুখ সম্মুখ; বিভুতি বিভূতি; যোগিশ্রেষ্ঠ যোগীশ্রেষ্ঠ; মধ্যাহ্ণ মধ্যাহ্ন; কিরণ কিরন; কিরিট কিরীট; পরিণত পরিনত; পুণ্য পুন্য; মুহূর্ত মুহুর্ত; স্পর্ষ স্পর্শ; উর্ধ উর্ধ্ব; মন্দাকিনী মন্দাকিণী; যন্ত্রণা যন্ত্রনা; নারায়ন নারায়ণ; দুখ দুঃখ।

৯। নিম্নলিখিত পদগুলির সাধু রূপ লিখ :—

দেখলুম; ক'রছে; তাতে; হ'য়ে; পাচ্ছে; ক'রেছে; দাঁড়ালুম; হ'লো; ক'রলে; নেই; এ; নয়; আটকে; দাঁড়াতো; যার; তা; ভেঙেগ; গলছে; যাচ্ছি; ফেললেই; পড়লো।

১০। স্থূলাক্ষর পদগুলির পদ পরিচয় দাও :—

(ক) একে ত ক্রমাগত সোজা উপরের দিকে উঠা, প্রতিপদে পা ভাঙ্গে এবং নিঃশ্বাস আটকে আসে, তার উপর পায়ের নীচে বরফের স্তূপ।

(খ) চারিদিকে কেমন শান্তি কত পবিত্রতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিণত জীবনে কিছু আত্মকথা জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন—জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ইত্যাদি। এই সমস্ত আত্মকথামূলক রচনায় তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবনের পরিচয় লিপিবন্ধ আছে। পরিণত জীবনে মহৎ কবি হবার প্রস্তুতি হিসাবে শৈশব ও কৈশোরের একটি স্বপ্নমুগ্ধ, কল্পনাপ্রধান ও অনুভূতি-প্রবণ শিশু-হৃদয়ের পরিচয় তাঁর 'ছেলেবেলা' রচনাংশটিতে পাওয়া যায়।]

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট ; এক মিনিটের তফাৎ হবার যো ছিল না। খট্‌খটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, একদিনের জন্যেও মাথাধরার সুযোগ ঘটলো না। বই নিয়ে, স্লেট নিয়ে, যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত, সবই বাংলায়—পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে 'সীতার বনবাস' থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মেঘনাদবধ কাব্যে।' সঙ্গে ছিল 'প্রাকৃত বিজ্ঞান'। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত, বিজ্ঞানের ভাসা ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস পরখ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে 'মুগ্ধবোধ' মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানা রকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই

ভিতরে ভিতরে চুরি করে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে ; জালের মধ্যে ফাঁক করে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফস্‌কিয়ে যেতে চায় ; আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মত হয় না।

বারান্দার আর এক ধারে বুড়ো দর্জি, চোখে আতশ কাঁচের চশমা, ঝুঁকে পড়ে কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে—চেয়ে দেখি আর ভাবি, কি সুখেই আছে নেয়ামৎ। অঙ্ক কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায়, চোখের উপর স্লেট আড়াল করে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকনপরা ছিপছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সক্কালেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে—ঘেউ ঘেউ করে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতে-ছিলাম আতার বিচি। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরোবে দেখবার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল ভাত মাছের ঝোলের বাঁধা ভোজ। রুচি হয় না খেতে।

ঘণ্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা আম-ওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চল্‌ছে দূরের থেকে দূরে। গলির ধারের বাড়ির ছাতে বড়োবউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদ্‌দুরে ; তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ

ছিল না। মনে হত মেয়ে-জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পাল্কি-গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিম্‌নাস্‌টিকের মাষ্টার এসেছেন। কাঠের ডাণ্ডার উপর ঘণ্টা-খানেক ধরে শরীরটাকে উলট-পালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাষ্টার।

ক্রমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচ-মিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইঁটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘরে জ্বলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাষ্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢলঢলে ; পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি ; অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে, তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি, তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।

অনুশীলনী

১। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের গৃহ-শিক্ষার পরিচয় দাও।

২। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে বালক রবীন্দ্রনাথ বাহিরের বারান্দায় কি দেখিতেন ?

৩। দুপুর বেলা স্কুলে যাইবার সময় বালক রবীন্দ্রনাথের কি মনে হইত ?

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—
দেউড়ি, নিরেট, নমাজ, কাঁকই, বরাদ্দ, জিম্‌নাস্‌টিক, আঙিনা।

৫। ব্যাখ্যা কর :—
এমনি করে সারা সকাল জুড়ে...........ফস্‌কিয়ে যেতে চায়।

৬। তাৎপর্য পরিস্ফুট কর :—
(ক) কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর...........সুযোগ ঘটলো না।
(খ) তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাস্টার।
(গ) চেয়ে দেখি আর ভাবি...........নেয়ামৎ।
(ঘ) মনে হত মেয়ে জন্মটা নিছক সুখের।
(ঙ) বুড়ো ঘোড়া...........আন্দামানে।
(চ) কালো কালো মলাটের...........টেবিলের উপর।
(ছ) যত পড়ি...........অনেক বেশি।

৭। টীকা লিখ :— সীতার বনবাস; মেঘনাদবধ কাব্য; প্রাকৃত বিজ্ঞান; মুগ্ধবোধ; আতশ কাঁচের চশমা; নীলকমল মাস্টার; নেয়ামৎ দর্জি; দশটা চারটার আন্দামান; ইঁটকাঠের দৈত্য; নমাজ।

৮। বাক্য রচনা কর :—

ঘড়ি ধরা; নিরেট; খট্‌খটে; একদম; ভাসা ভাসা; পরখ করে; ছিপছিপে; ছট্‌ফট্; উদাস করা; ঠংঠং; উলট পালট; পাঁচমিশালি; কালো কালো; ঢল্‌ঢলে; ওৎ পেতে; যতই......ততই; ডেকে ডেকে; ভিতরে ভিতরে; দূরের থেকে দূরে।

৯। শুদ্ধ বানান শিখ (প্রত্যেকটি শব্দ ৫ বার করিয়া লিখ) :—

স্বাস্থ্য; গণিত; মুখস্থ; তত্ত্ব; বিজ্ঞান; স্বপ্ন।

১০। স্থূলাক্ষর অংশের পদ পরিচয় দাও :—

ঘড়ি ধরা সময় ছিল **নিরেট**। **রোগা** শরীর। **ভাসা ভাসা** খবর। **জানা** জিনিস। মাঝে **একবার** এলেন হেরম্ব তত্ত্বরত্ন। **মাঝে মাঝে** নমাজ পড়ে নিচ্ছে। **কাঁকনপরা** ছিপছিপে ছোকরা দরোয়ান। **ছিটিয়ে** পড়া ছোলা। ঝাঁট দিয়ে **জমা করা** ধূলো। শেষ **পর্যন্ত আমার আশা** মেটে নি। সূর্য **উপরে** উঠে যায়। রোজকার **বরাদ্দ** ডাল, ভাত, মাছের ঝোলের **বাঁধা** ভোজ। মন **উদাস-করা** ডাক শোনা যায়। মেয়ে জন্মটা **নিছক** সুখের। দিনের **খরচে** পড়া আলো। ওৎ পেতে **রয়েছে** টেবিলের উপর। পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি। অজায়গায় হাত পাকিয়েছি।

১১। সাধু গদ্যে লিখ :—

(ক) এমনি করে সারা সকাল জুড়ে............শোনাবার মত হয় না।

(খ) ঐখানে ঘোড়াটা............দেয় তাড়া।

(গ) সূর্য উপরে............রুচি হয় না খেতে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

[গ্যালিলিওর জন্ম ১৫৬৪ খ্রীঃ অঃ এবং মৃত্যু ১৬৪২ খ্রীঃ অঃ। মধ্যযুগের এই ইতালীয় বৈজ্ঞানিক নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। এই রচনাটির মধ্যে গ্যালিলিওর চমকপ্রদ জীবন কাহিনী ও আবিষ্কারগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।]

ইটালি দেশের পিসা শহরের এক গির্জার অভ্যন্তর। ছাত হতে একটা শিকল নেমে এসেছে, তার থেকে একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। অপরদিকে জানালাগুলি খোলা, এক একবার হাওয়া আসছে আর ঝাড়টাকে দোলাচ্ছে। গির্জার মধ্যে একটি বালক বসেছিল আর ঝাড়ের দোলনটা লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল, দোলনটা বেশি হোক বা কম হোক, দোলনকাল যেন একই। কিন্তু দোলনকাল কি করে মাপা যেতে পারে? এ হল তিন শ' বছর আগেকার কথা, ঘড়ি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বালকটি ফস্ করে নিজের নাড়ীটা টিপে সময় নির্ধারণ করতে লাগল, আর দেখল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। দোলনের বিস্তার কম বেশি যা-ই হোক, দোলনকাল সমান।

সতের বছরের বালক গ্যালিলিও সেদিন বিজ্ঞানের এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবে নিল যে, নাড়ীর স্পন্দন দিয়ে যদি দোলকের দোলনকাল মাপা যায়, তবে অন্যদিকে একটা দোলকের দোলনকাল লক্ষ্য করে নাড়ীর স্পন্দনকাল মাপা সম্ভব হবে। বেশিদিন গেল না, সে একটা ছোট যন্ত্র তৈরি করল,

যা দিয়ে নাড়ীর গতি মাপা সম্ভব হল। এই যন্ত্র ডাক্তারদের খুব কাজে লেগে গেল, গ্যালিলিওর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী গ্যালিলিও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও গণিতজ্ঞ। কিন্তু এসব চর্চায় পয়সা নেই ভেবে তিনি ছেলেকে কাপড়ের ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন। গ্যালিলিও দুদিনেই দেখলেন, সে কাজ তাঁর নয়। তিনি পিতাকে বুঝিয়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে গেলেন।

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের দার্শনিকেরা যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন, হাজার বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই পড়ান হয়ে আসছিল। কিন্তু গ্যালিলিও ছাত্র হয়ে এসে সব কথাতেই অধ্যাপকদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে লাগলেন। তখনও পর্যন্ত গ্যালিলিও গণিতবিদ্যার বিশেষ কিছু জানতেন না। এক সুযোগ এলো। এই সময় একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গণিতের ছাত্রদের কাছে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে থাকেন। গ্যালিলিও গণিতের ছাত্র নন, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি ওই সব বক্তৃতা শুনে যেতেন। শেষে একদিন সাহস করে তিনি ওই অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। অধ্যাপক গ্যালিলিওর কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ছাত্র হিসেবে নিয়ে নিলেন। অল্পকালের মধ্যে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বলে গ্যালিলিও প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

এর কিছুদিন পরে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হলেন, কিন্তু তাঁর বেতন হল সপ্তাহে মাত্র পাঁচ শিলিং। এখন অপর অধ্যাপকদের সঙ্গে গ্যালিলিওর ঠোকাঠুকি লাগল। বহু শতাব্দী আগে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বিজ্ঞানের যে সব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, নির্বিচারে লোকে সে সকল এতদিন মেনে আসছিল। গ্যালিলিও বললেন, ওসবের প্রত্যেক কথা যাচাই করে দেখতে হবে। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেছিলেন, একটা একশ' পাউন্ডের ওজন ও এক পাউন্ডের একটা ওজন উপর থেকে ছেড়ে দাও, একশ' পাউন্ডের ওজন একশ' গুণ দ্রুত পড়বে। গ্যালিলিও বললেন, বাজে কথা, তারা একই সঙ্গে পড়বে।

১৫৯১ সালে একদিন সকালে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যেরা ও অন্য অনেক দর্শক ওই জায়গায় বিখ্যাত আনত মিনারের পাদদেশে

সমবেত হলেন। গ্যালিলিও মিনারের উপরে উঠলেন ও সেখান থেকে একটা ছোট বল ও তার একশ' গুণ ভারী একটা বড় বল একসঙ্গে ছাড়লেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকেই দেখল যে, বল দুইটি একই সঙ্গে মাটিতে পড়ল, মাটিতে আঘাত করার শব্দও তারা শুনল। এতদিন ধরে মানুষ যে ধারণা করে আসছিল, প্রকৃতি সুনিশ্চিতভাবে তার প্রতিবাদ করল। কিন্তু নিজেদের চোখ-কান যা-ই জানাক, এই বলাবলি করতে করতে লোকেরা বাড়ি ফিরল,— তা বলে কি শাস্ত্রবাক্য অমান্য করতে হবে ; গ্যালিলিওকে যে করেই হোক দাবিয়ে রাখা দরকার। আর তারা করলও তাই।

তখনও নিউটন জন্মাননি। তাঁর প্রবর্তিত গণিতবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু গ্যালিলিও পতনশীল পদার্থ সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম প্রকাশ করলেন। পিসাতে তাঁর শত্রুর সংখ্যা বাড়তে লাগল, বাধ্য হয়ে তাঁকে এখানকার চাকুরি ছাড়তে হল, কিন্তু পাড়ুয়াতে তিনি এখানকার চেয়ে ভালো একটা চাকুরি পেলেন। পাড়ুয়াতে তিনি আঠার বছর অধ্যাপনার কাজ করলেন, দেশময় তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ল।

১৬০৯ সালে যখন তিনি একবার ভিনিসে গিয়েছেন, শুনলেন, লিপারসে নামে এক চশমা বিক্রেতা এক যন্ত্র তৈরি করেছে, যা দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখায়। লিপারসের যন্ত্র দেখবার চেষ্টা না করেই গ্যালিলিও নিজে সেই রকমের এক যন্ত্র তৈরির কাজে লেগে গেলেন। একটা অর্গান পাইপ নিয়ে তার দুদিকে দুখানা চশমার কাঁচ বসালেন, একখানা উত্তল পিঠ উঁচু লেন্স, অপরখানা অবতল পিঠ-বসা লেন্স। ব্যস একটা দূরবীণ হল, দূরের জিনিস কাছে দেখাল। এ দিয়ে গ্যালিলিও অনেক নতুন নক্ষত্র দেখলেন, খালিচোখে যাদের দেখা যায় না। দিন দিন তিনি যন্ত্রের উন্নতি-সাধন করতে লাগলেন। একটা ভালো যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে গ্যালিলিও আনন্দে অধীর হলেন। এর আগে মানুষ কোনদিন যা দেখেনি, সে সব তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল। চাঁদের ওই যে সব কালো কালো রেখা আমরা দেখি, সাধারণ লোকে যা চাঁদের কলঙ্ক বলে, গ্যালিলিও দেখলেন, সেগুলো ওখানকার পর্বতশ্রেণী, মাঝে মাঝে গভীর গর্ত। পরিষ্কার রাত্রে দেখা যায় সমস্ত আকাশ জুড়ে এধার থেকে ওধার অবধি আলোর একটা ধারা যেন চলে গিয়েছে,

একে বলা হয় ছায়াপথ। গ্যালিলিও তাঁর তৈরি দূরবীক্ষণ দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, ওটা বহুসংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টি, আর কিছু নয়। সূর্যকে যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে, গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ সুনিশ্চিতভাবে তা প্রমাণ করল। গ্যালিলিওর শত্রুরা বিভ্রান্ত হল।

এই সময়ে গ্যালিলিও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ কেপ্‌লারকে লিখেছেন—

প্রিয় কেপ্‌লার, আমরা দুজনে কাছাকাছি থাকলে খুব এক চোট হেসে নিতুম। পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককে দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের গ্রহনক্ষত্র নিরীক্ষণ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলুম। তিনি এলেন না পাছে চোখে দেখে স্বীকার করতে হয় যে. সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত সফল হল। গ্যালিলিও বিচারকদের সম্মুখে আনীত হলেন, অভিযোগ, শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার বিরুদ্ধ কথা তিনি প্রচার করছেন। বলা বাহুল্য, বিচারকের মধ্যে একজনও বিজ্ঞানী ছিলেন না। গ্যালিলিওর প্রতি আদেশ হল, তিনি তাঁর মত প্রচারে বিরত থাকবেন, আর তা না হলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। গ্যালিলিও প্রথমটায় স্বীকৃতি দিয়ে চলে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কথা রাখলেন না। যুক্তি দিয়ে শাস্ত্রীয় মত খণ্ডন করে, নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করে তিনি এক পুস্তক প্রকাশ করলেন। ফলে তাঁকে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হল. তবে লোকজন দেখা করার কোন বাধা হইল না। এখানে ইংলণ্ডের মহাকবি মিলটন্ গ্যালিলিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে জানান যে তাঁর বই ইংলণ্ডের বহু লোক আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছে। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হতে লাগলো। তিনি বধির হলেন, শেষে দৃষ্টিশক্তি হারালেন।

দৃষ্টিহীন, বয়স আশির কাছাকাছি, তখন গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে, তিনি তাঁর পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন. কি করে একটা দোলকের সাহায্যে একটা ঘড়ির চলার হার কমানো বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সেই নতুন ঘড়ি তৈরি হবার আগেই, ১৬৪২ সালের ৮ই জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এরও পরের কথা আছে। তাঁর শত্রুরা পোপকে দিয়ে ঘোষণা করালেন যে, তাঁর কবরের উপর কোন সমাধিস্তম্ভ থাকবে না। কারণ, তিনি বন্দী অবস্থায় দেহত্যাগ করেছেন। তখন অবশ্য তা লোকে মেনে নিল, কিন্তু ভবিষ্যতে সংস্কারমুক্ত দেশবাসী সেখানে উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছিল। আর আজ পৃথিবীতে যে কেউ ঘড়ির একটি টিক্ শব্দ শোনে বা একটি দূরবীক্ষণের মধ্য দিয়ে বহির্জগৎ নিরীক্ষণ করে, সে-ই গভীর শ্রদ্ধায় গ্যালিলিওকে স্মরণ করে।

অনুশীলনী

১। গ্যালিলিও সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। গ্যালিলিওর আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। গ্যালিলিওর শেষ জীবনের পরিচয় সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইয়াছিল কেন? কাহারা এই চক্রান্ত করিয়াছিল? এই চক্রান্তের ফল কি হইয়াছিল?

৫। বালক বয়সে গ্যালিলিও কি ভাবে বিজ্ঞানের এক নতুন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন?

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—স্মৃতিস্তম্ভ, দোলনকাল, আবিষ্কার গণিতজ্ঞ নির্বিচার, শাস্ত্রবাক্য, পতনশীল, ইহলোক, সমাধিস্তম্ভ, সংস্কারমুক্ত, দূরবীক্ষণ, অবরুদ্ধ, লিপিবদ্ধ, বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধি, শতাব্দী।

৭। টীকা লিখ :—ঝাড়; পিসা বিশ্ববিদ্যালয়; অ্যারিস্টটল্; পিসার আনত মিনার; নিউটন; চাঁদের কলঙ্ক; ছায়াপথ; জ্যোতির্বিদ; কেপলার; মহাকবি মিলটন।

৮। বাক্য রচনা কর :—ফস্ করে; বিস্তার; লিপিবদ্ধ; মুগ্ধ; প্রসিদ্ধি; ঠোকাঠুকি; নির্বিচারে; যাচাই; পাদদেশে; সমবেত; জনমণ্ডলী; সুনিশ্চিতভাবে; চোখ-কান; বলাবলি; প্রতিষ্ঠিত; পতনশীল; উন্নতিসাধন; দৃষ্টিপথে; আনীত; বলা বাহুল্য; স্বীকৃতি; শাস্ত্রীয়; অবরুদ্ধ।

৯। প্রত্যেকটি শব্দের বানান শিখ ও ৫ বার করিয়া লিখ :—

ধারণা; শত্রু; সংখ্যা; দূরবীণ; পরিষ্কার; বহুসংখ্যক; প্রদক্ষিণ; প্রমাণ; নিমন্ত্রণ; স্বীকৃতি; স্বাস্থ্য; গবেষণা; নিরীক্ষণ।

১০। স্থূলাক্ষর পদের পদ পরিচয় দাও :—(ক) লিপারসে নামে এক চশমা বিক্রেতা এক যন্ত্র তৈরী করেছে, যা দিয়ে দূরের জিনিস কাছে দেখায়। (খ) তিনি বধির হলেন, শেষে দৃষ্টিশক্তি হারালেন।

১১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—অভ্যন্তর, আবিষ্কৃত, নির্ধারণ, শতাব্দ, সম্মুখ গবেষণা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য, শাস্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। আলোচ্য রচনাটিতে লেখক বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য, উদারতা, ধর্মানুরাগ ও নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছেন।]

হিউয়েন-সাঙ্ চীনদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময়ে জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ বৌদ্ধধর্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। ইঁহার নাম শীলভদ্র, ইনি সমতটের এক রাজার ছেলে। হিউয়েন-সাঙ্ যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ। বড় বড় রাজা, এমন কি সম্রাট হর্ষবর্ধন পর্যন্ত, তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন। কিন্তু সে পদের গৌরব—মানুষের নহে। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "নানা দেশে, নানা গুরুর নিকটে

বৌদ্ধ শাস্ত্রের ও বৌদ্ধ-যোগের গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া আমার যে সকল সন্দেহ কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সে সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-পণ্ডিত আমার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছেন।" শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। ইহা ত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড় বড় মহাযান বিহারের কর্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত। কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল, এবং সে সময় উহার যে সকল টীকা টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণদের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি হিউয়েন-সাঙ্‌কে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্বশাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল।

হিউয়েন-সাঙ'য়ের পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "চীন একটি মহাদেশ, হিউয়েন-সাঙ্‌ ঐখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্ধর্মের অনেক উন্নতি হইবে. এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন ভাস্করবর্মা হিউয়েন-সাঙ্‌কে কামরূপ যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে এখনও বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধধর্মের কিছুমাত্র বিস্তার হয় তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতিকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি সমতটের রাজার ছেলে ; তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল, এবং খ্যাতি ও প্রতিপত্তি খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত

হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল তখন সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ধর্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধধর্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে, বিধর্মীরা চারিদিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর না করিতে পারিলে সদ্ধর্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।"

শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী হাসিয়া উঠিলেন, "এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে!" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। তিনি শীলভদ্রের না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন, না বচনের উত্তর দিতে পারিলেন; লজ্জায় অধোবদন হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, তখন অর্থ লইয়া কি করিব?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতিঃ ত বহুদিন নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম কিরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া দিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি প্রায় কুড়িখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও তাহার ভাষা অতি সরল।

অনুশীলনী

১। শীলভদ্রের জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। শীলভদ্রের ঐকান্তিক ধর্মানুরাগের পরিচয় কোন্ কোন্ ঘটনায় পাওয়া যায়?

৩। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য ও নিঃস্বার্থতার একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৪। শীলভদ্রের বাল্যকালের পরিচয় দাও।

৫। নালন্দা ও কামরূপের পরিচয় দাও।

৬। "আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি, অর্থ লইয়া কি করিব?"
—ইহা কে কখন এবং কেন বলিয়াছিলেন?

৭। অর্থ লিখ :—তটস্থ, বোধিসত্ত্ব, বিচক্ষণ, জ্ঞানজ্যোতিঃ, দিগ্বিজয়ী, আদিত্য, বহুদর্শী, দূরদর্শিতা, বিধর্মী, সংশয়, সম্ধর্ম, ধর্মানুরাগ, নীতিকৌশল অধোবদন, রাজস্ব, কাষায়।

৮। টীকা লিখ :— মহাযান; সঙ্ঘারাম; বিহার; হিউয়েন-সাঙ্; যোগ: পাণিনি; সমতট; নির্বাণ।

৯। বাক্য রচনা কর :—
আয়ত্ত; বিধর্মী; সংশয়; বিস্তার; বহুদর্শী; তটস্থ; বিচক্ষণ; দূরদর্শিতা; প্রতিপত্তি; অনুরাগ; সর্বময়; নিষ্ঠা; অস্তমিত; আবশ্যক; উদারতা।

১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
তিনি গুরুকে—মত ভক্তি করিতেন। ব্রাহ্মণদের আদিগ্রন্থ—। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের—ছিল। —অধোবদন হইয়া তিনি সভা—করিলেন। যদি আমরা গুণের—না করি তবে ধর্ম কিরূপে—হইবে?

১১। বানান শিখ :—(প্রত্যেকটি শব্দ পাঁচ বার করিয়া লিখ)
শিষ্য; শাস্ত্র; বিচক্ষণ; অধ্যয়ন; আয়ত্ত; সংশয়; পাণিনি; উচিত: দূরদর্শিতা; দক্ষিণ; সম্পূর্ণরূপে; নির্বাণ; পরিষ্কার; ভ্রমণ; অন্যান্য; নীতি; খ্যাতি; গ্রহণ; গুণ।

১২। প্রতিশব্দ লিখ :—
আবশ্যক; অনুরাগ; আদিত্য; সংশয়; শিষ্য; অধ্যয়ন; উচিত; খ্যাতি; বেশী; গৌরব; গ্রন্থ; গুরু; আদি; পরম; প্রতিপত্তি; উদ্যোগ; রাজা; প্রকাণ্ড।

১৩। পাঠ অতিরিক্ত অনুশীলন :—
শীলভদ্রের ন্যায় আর একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীর নাম কর। তাঁহার পরিচয় সংক্ষেপে বল।

১৪। 'নালন্দা বিহার' সম্বন্ধে ১০টি বাক্য রচনা কর।

১৫। 'নালন্দা বিহার'-এর মত আরও ২।১টি বৌদ্ধবিহারের নাম কর।
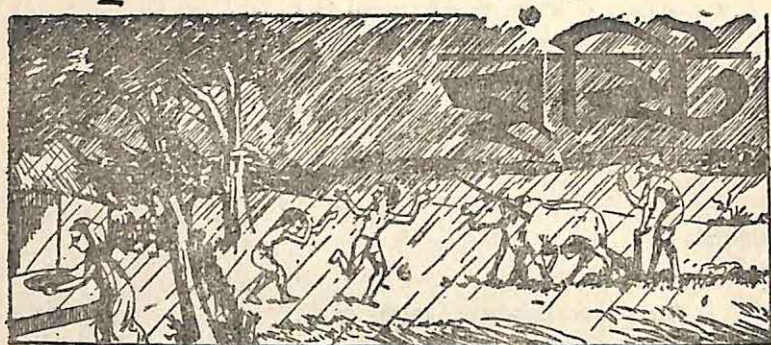
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বৃষ্টি' একটি বিচিত্র রসের রচনা। এখানে লেখক বৃষ্টিকে সজীব কল্পনা করিয়া তাহার ঐক্যশক্তি, বৃষ্টির আবির্ভাবে পৃথিবীর আহ্লাদ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।]

চল নামি,—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না। অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে, এই পৃথিবী ভাসাইব।

পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহা-কল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু! ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি, বায়ু তো আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যের বল নহিলে আমরা কেহ নই। চল, আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে, ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনেবউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। দুই একখানা রেখে যা না —আমরা খাব। দে উহার কাপড় ভিজিয়ে দে।

আমরা জাতিতে জল কিন্তু রঙ্গরস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তার কাজ বাড়াইয়া রাখি। আমরা কি কম পাত্র!

তা যাক্, আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্মাণ করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে?

অনুশীলনী

১। 'বৃষ্টি' রচনাটি অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যা কর—"যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই সেই তুচ্ছ।"

২। ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু শক্তিশালী হইল কি করিয়া?

৩। বৃষ্টির আগমনে পৃথিবীর আনন্দ বর্ণনা কর।

৪। বৃষ্টির রঙ্গরসের পরিচয় দাও।

৫। ব্যাখ্যা কর :—আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে?

৬। অর্থ লিখ :—যূথিকাকলি, স্ফটিক, আহ্লাদ, পর্বত-কন্দর, অর্বুদ নির্ঝরপথে, মহাকল্লোলে, ভীমবাদ্য, মহারঙ্গে, রঙ্গরস।

৭। টীকা লিখ :—বর্ষাযূথ; বেনেবউ; আমসী ও আমসত্ত্ব; ফলার।

৮। বাক্য রচনা কর :—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শূন্যহৃদয়, মহারঙ্গে, দেশান্তরে, জলময়।

৯। প্রত্যেকটি শব্দ ৫ বার করিয়া লিখ :—

শুষ্ক; আষাঢ়; প্রচণ্ড; কিরণ; রূপ; ক্রীড়া; আহ্লাদ; শস্যক্ষেত্র; তৃণ, প্রণাম; ধান্যক্ষেত্র; নির্মাণ।

১০। স্থূলাক্ষর পদের পদ পরিচয় দাও :—

(ক) কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু! ইস্! (খ) বায়ু তো **আমাদের গোলাম**। (গ) **আমরা** ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? (ঘ) **দেখ ভাই, কেহ একা** নামিও না। (ঙ) **দুই একখানা** রেখে যা না—**আমরা খাব**।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায়

যাযাবর

[আমাদের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম সিপাহী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এই সংগ্রামে ভারতের হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। 'যাযাবর' ছদ্ম-নামে পরিচিত লেখক এই সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের জীবন্ত বর্ণনা দিয়াছেন। সিপাহীদের অসীম বীরত্ব এবং হতভাগ্য মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ ও তাঁহার পরিবারের শোচনীয় পরিণতির কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।]

রবিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসন্ন রজনীর ঈষৎ অন্ধকার নামলো মীরাটের ছাউনীতে। ব্রিটিশ সৈন্যেরা তৈরী হয়েছে চার্চ প্যারেডের জন্য। ভারতীয় সৈন্যেরা করছে কী! বোধ হয় বিশ্রাম। এমন সময় অকস্মাৎ আওয়াজ এলো,—

গুড়ুম!

পদাতিকবাহিনীর সিপাহীরা অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরেছে ব্রিটিশ সেনানায়কদের ঠিক ললাটে। বন্দুকের ঘোড়া টিপছে ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর ও প্রান্তর কাঁপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

উত্তর-ভারতে সংগ্রামের সেই হলো প্রারম্ভ!

নেতৃত্ববিহীন, অসঙ্ঘবদ্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনাহীন পদ্ধতি বিভিন্ন অংশে যোগাযোগশূন্যতা এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশের অভাবে ব্যর্থ হলেও একথা আজ স্বীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বরাষ্ট্র গঠনে ভারতীয়দের সেই প্রথম উদ্যোগ।

মীরাটের সিপাহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পরদিন প্রভাতে এসে পৌঁছল দিল্লীতে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ্ তখন দিল্লীর মসনদে। বাবরের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত্ব তাঁর নেই। তাই জনসাধারণের সংগ্রামোন্মুখ ব্রিটিশবিদ্বেষকে সফল পরিণতি দান করতে পারলেন না তিনি।

দিল্লীর পরিধি সাতমাইল। অধিবাসীরা উত্তেজিত। ইংরেজের শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার রণনিপুণ সিপাহী তার পাহারা। নগর-প্রাচীরের উপরে ১৪টি বৃহদাকার কামান। দুর্গাভ্যন্তরে বৃহত্তম বারুদখানা। আছে বহু সুদক্ষ গোলন্দাজ, বেশীর ভাগই দুদিন পূর্বে ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদলভুক্ত। তারা য়ুরোপীয় যুদ্ধরীতিতে সুশিক্ষিত, সুনিপুণ এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধ।

কিন্তু তবুও সিপাহীরা হারলো। দিল্লী দখল করলো ইংরেজ। ভারতে মুসলিম রাজত্বের ঘটালো সমাপ্তি। শতবর্ষ পূর্বে নির্মিত সম্রাট সাজাহানের লালকেল্লার শীর্ষে উত্তোলিত হলো ব্রিটিশ পতাকা।

১৪ই সেপ্টেম্বর। রাত্রি প্রায় নিঃশেষিত, যদিও আলোর রেখা দেখা দেয়নি আকাশে। ইংরেজবাহিনী আক্রমণ করলো দিল্লী দুর্গ। পূর্ববর্তী ছয়দিন দিবারাত্রি-ব্যাপী গোলাবর্ষণের দ্বারা নগর-প্রাচীর বিধ্বস্ত করা হয়েছে ধীরে ধীরে। মূল আক্রমণের সেই ভূমিকা। কাশ্মীরী গেটের দিকে খণ্ড খণ্ড দলে হানা দিল ইংরেজের সৈন্য। দুই পক্ষের কামানগর্জনে দুরু দুরু কম্পিত হলো দূর দূরান্তের গৃহগবাক্ষ, তাদের অগ্নিবর্ষণের রক্তিম আভায় রঞ্জিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এক মরণপণ যুদ্ধ চললো প্রহরের পর প্রহর। অবশেষে বিকট শব্দে কাশ্মীরী গেটের রুদ্ধদ্বার বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল ধুলায়। এঞ্জিনিয়ার-বিভাগের ক্ষুদ্র একটি দল সরীসৃপের মতো বেয়ে উঠেছে প্রাচীরে। বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগের দ্বারা বিচূর্ণ করেছে সুদৃঢ় ফটক। তাদের অমানুষিক সাহসের ফলেই জয়লাভ সম্ভব হলো ইংরেজের।

সেই ভগ্নদ্বার পথে জয়দৃপ্ত ব্রিটিশবাহিনী প্রবেশ করলো ভীমবেগে। বিপক্ষকে আক্রমণ করলো দ্বিগুণ তেজে। উন্মত্ত

তরবারি হস্তে সেনাপতি নিকলসন পরিচালনা করছিলেন সেই সৈন্যদল। জনৈক সিপাহী নিশানা করলো তাঁকে। আর্তনাদ করে তিনি ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন।

পরাজিত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ পলায়ন করলেন দুর্গ থেকে। তিনি ধৃত হলেন। বন্দী সম্রাটকে হড্‌সন পাল্কী করে নিয়ে এলো দিল্লীতে। সেখানে বিচার হলো তাঁর। দন্ড হলো নির্বাসন ব্রহ্মদেশে। সেখানে পাঁচ বছর পরে বন্দীদশায় জীবনান্ত ঘটলো তাঁর। হতভাগ্য বাহাদুর শাহ্ ;—ভারতের শেষ মুশ্লিম সম্রাট।

ঠিক যেখানে বাহাদুর শাহ ধৃত হন, হুমায়ুনের সেই সমাধি-মন্দিরেই পরদিন সেনাপতি হড্‌সন গ্রেপ্তার করলো আরও তিনটি পলাতককে। বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্র। তাঁরা স্বেচ্ছায়ই ধরা দিয়েছিলেন।

হড্‌সন তাঁদের এক ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এলো দিল্লীতে। দিল্লীগেটের কাছে এসে হড্‌সন থামালো সে গাড়ি। বন্দুক নিয়ে নিজের হাতে পর পর গুলী করলো বন্দীদের ঠিক বুকের মাঝখানে। মৃতদেহ নিয়ে চাঁদনী-চকের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনীরূপে রাখা হলো তিন দিন। সম্রাট-বংশধরদের বিকৃত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল পথচারীর দল, বারংবার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মার্জনা করল নিঃশব্দে।

এমনি করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অধ্যায় সাঙ্গ হলো।

অনুশীলনী

১। স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে কাহিনী এখানে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিজের ভাষায় গল্পাকারে লিখ।

২। সম্রাট্ বাহাদুর শাহের শেষ পরিণতি কি হইল এই গল্প হইতে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

৩। 'কিন্তু তবুও সিপাহীরা হারলো।' —এই কাহিনী হইতে সিপাহীদের এই পরাজয়ের কারণ নির্দেশ কর।

৪। শব্দার্থ লিখ :—

মসনদ, গৃহগবাক্ষ, বিধ্বস্ত, রুদ্ধদ্বার, সাঙ্গ, নিশানা, বারুদখানা, ভীমবেগে।

৫। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের আর কোন কাহিনী তোমার জানা থাকিলে তাহা গল্পাকারে লিখ।
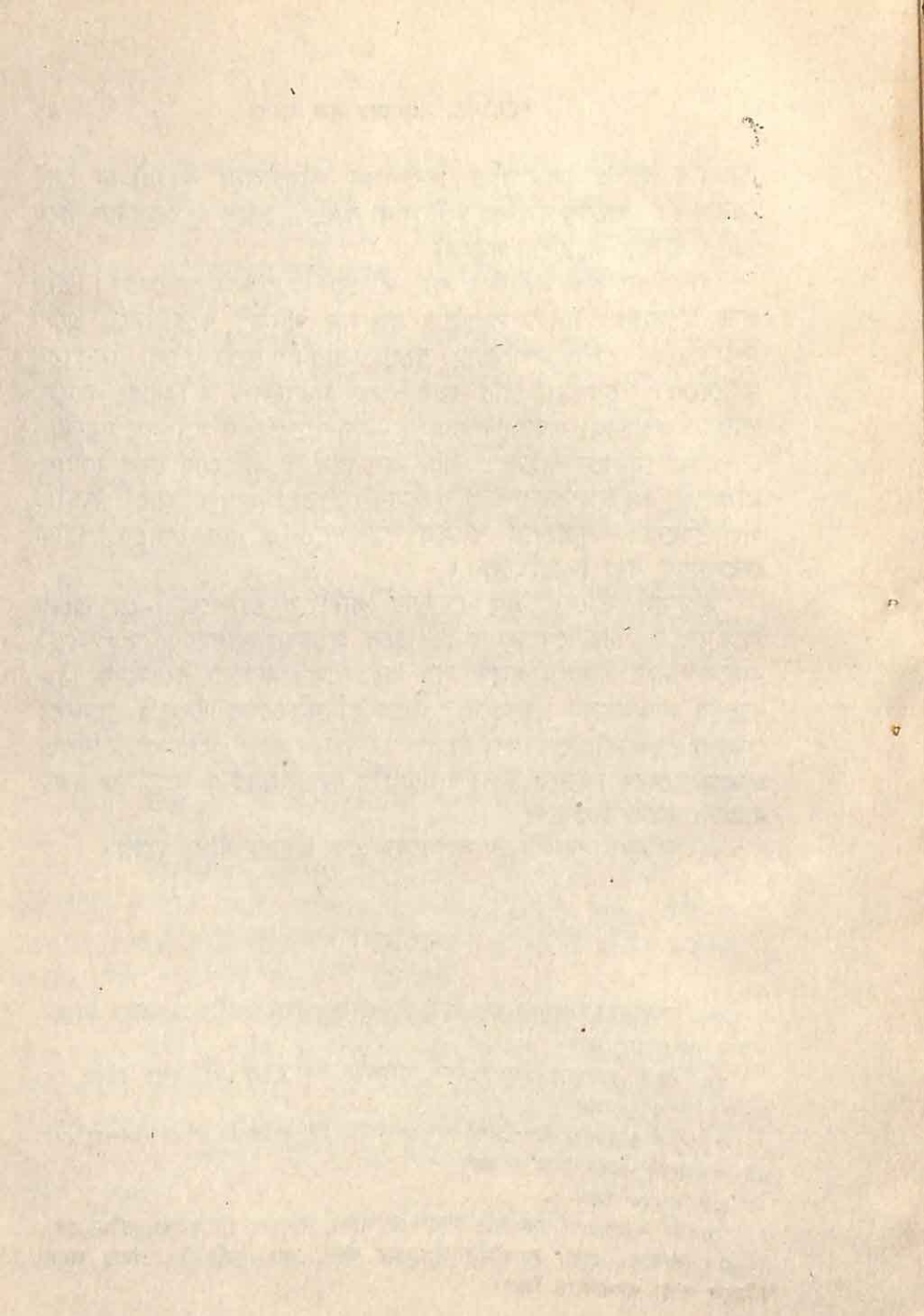
পদ্যাংশ

বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

[কবি ও সংগীতরচয়িতা অতুলপ্রসাদ সেনের এই কবিতাটিতে মাতৃভাষা বাংলা ভাষার প্রতি কবির মমতা প্রকাশিত হইয়াছে।]

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা!

কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে ;
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা!

ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আনল দেশে ভক্তি ধারা ;
আছে কই এমন ভাষা
এমন দুঃখ ক্লান্তিনাশা।

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন্,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
এই ফুলেরই মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা।

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে ;
তোমার চরণ-তীর্থে মা গো,
জগৎ করে যাওয়া আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা বলে,
ঐ ভাষাতেই বলব হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে বাংলা ভাষার প্রতি কবির প্রীতির কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

২। 'বাংলা ভাষা' কবিতাটিতে বাংলা ভাষার গৌরবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ কর।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—
বোলে, ক্লান্তিনাশা, বীণ, চরণতীর্থ, ডাকনু, সাঙ্গ।

৪। ব্যাখ্যা কর :—
(ক) বাজিয়ে রবি তোমার...........যাওয়া আসা।
(খ) এই ভাষাতেই প্রথম...........হলে কাঁদা-হাসা।

৫। টীকা লিখ :—বাউল, নিতাই গোরা; ভক্তিধারা; তোমার চরণতীর্থে।

৬। গদ্য রূপ লিখ :— গরব; বীণে; জিনে; ডাকনু।

৭। বিদ্যাপতি...........নবীন —প্রত্যেকের পুরা নাম লিখ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৮। তাৎপর্য পরিস্ফুট কর :—এই ফুলেরই...........মধুর বাসা।

গুরুদক্ষিণা

কাশীরাম দাস

[মধ্যযুগের কবি কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। প্রাচীনকালের গুরুভক্তির বিচিত্র নিদর্শন হিসাবে একলব্যের কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। এখানে চরিত্রশক্তিতে গুরু অপেক্ষা শিষ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহাভারতের গুরুভক্তির এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি বাংলা ভাষায় রূপ দিয়া কবি কাশীরাম প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটাইয়াছেন।]

হিরণ্য ব্যাধের পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিলা প্রণাম॥
জোড় হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন, তুই হ'স নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি॥

মৃত্তিকার দ্রোণ এক করি বিরচন।
নানা পুষ্প দিয়া বনে করিয়া পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্বমন্ত্র অস্ত্র জ্ঞান হইল ধনুর্দ্ধর॥
মৃগয়া করিতে যত কৌরব-নন্দন।
গিয়ে দেখে একলব্য ধ্যানে নিমগন॥
মৃত্তিকা-পুত্তলি অগ্রে করি যোড় কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
কুকুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুকুরের মুখে মারে সাত বাণ॥
না মরিল কুক্কুর না হইল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুকুরের রুধিলেক রা॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
জিজ্ঞাসা করিল বিদ্যা কোথায় অর্জন॥
এ হেন অদ্ভুত কর্ণে কভু নাহি শুনি।
বহুবিদ্যা জানি এই বিদ্যা নাহি জানি॥
ব্রহ্মচারী বলে মোর একলব্য নাম।
অস্ত্র শিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরু-স্থান॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
দ্রোণেরে কহেন পার্থ বিরস বদন।
আমারে আপনি কেন করিলে বঞ্চন॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদ কোঙরে॥
অর্জুনের বাক্যে দ্রোণ বিস্মিত অন্তর।
চলিলেন বনমাঝে দু'জনে সত্বর॥
দ্রোণে দেখি ব্যস্তে কয় নিষাদ নন্দন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কিবা প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবা॥
একলব্য দিল গোটা কাটিয়া অঙ্গুলি।
দ্রোণ-গুরু দক্ষিণা লইল তাই তুলি॥

অনুশীলনী

১। দ্রোণগুরু একলব্যকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে চাহেন নাই কেন?

২। 'গুরুদক্ষিণা' কবিতাটির কাহিনী সংক্ষেপে লিখ।

৩। একলব্য কি ভাবে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছিল?

৪। একলব্য গুরুকে কি দক্ষিণা দিয়াছিল? দ্রোণ কেন ঐরূপ দক্ষিণা চাহিয়াছিলেন?

৫। (ক) 'তোরে শিক্ষা.........অখ্যাতি' বক্তা কে? কাহাকে কি শিক্ষা করাইলে তাঁহার অখ্যাতি হইবে? কেন অখ্যাতি হইবে?

(খ) 'বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর'—ব্রহ্মচারী কে? তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা হইয়াছে কেন? তাহার হাতে ধনুঃশর কেন?

(গ) 'অলক্ষিতে কুকুরের রুধিলেক রা'—কোন কুকুরের 'রা' কেন রুধিল?

(ঘ) 'দ্রোণেরে কহেন পার্থ বিরস বদন'—পার্থ কে? তাঁহার বিরস বদন কেন? তিনি দ্রোণকে কি বলিলেন?

(ঙ) 'চলিলেন বন মাঝে দু'জনে সত্বর'—দু'জন কে কে? তাঁহারা বন-মাঝে সত্বর চলিলেন কেন?

৬। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির অর্থ পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বল :—

শিক্ষা করাইলে; করি বিরচন; মৃত্তিকা-পুত্তলি অগ্রে; দ্রোণ গুরু-স্থান; অগোচর নরে; ব্যস্তে কয়; যদি আমারে তুষিবা।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির অর্থ বল :—সদন, ধনুর্ধর, নিমগন, রা, পার্থ, বিরস, কোঙর, নন্দন, তুষিব, সত্বর, নিষাদ, নিরন্তর, ধনুঃশর, মৃগয়া, অপার, অলক্ষিতে।

৮। নিম্নলিখিত পদসমূহের গদ্য রূপ লিখ :—বিরচন; করিলা; আইলাম; নিমগন; ভাঙ্গিলেক; রুধিলেক; হেন; যতেক; বঞ্চন; কয়; হেথা; তুষিবা।

৯। বানান শিখ (প্রত্যেকটি শব্দ ৫ বার করিয়া লিখ) :—হিরণ্য; দ্রোণ; চরণ; প্রণাম; জোড়; নীচ; ব্রহ্মচারী; বাণ; ভ্রাতৃগণ; অর্জুন; কর্ণ; নিষাদ; ব্যস্ত; দক্ষিণা; অদ্ভুত।

১০। স্থূলাক্ষর পদের পদ পরিচয় দাও :—তুই হ'স নীচ জাতি। এ হেন অদ্ভুত কর্ণে কভু নাহি শুনি। আমাদের আপনি কেন করিলে **বঞ্চন**। দ্রোণে দেখি **ব্যস্তে** কয় নিষাদ নন্দন। **দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ** অঙ্গুলিটি দিবা।

কপোতাক্ষ নদ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬৫ সালে ফরাসী দেশের ভের্সাই নগরে অবস্থান কালে কবির স্মৃতিতে প্রতি মুহূর্তে স্বদেশের নানা কথা জাগরিত হইত। স্বীয় জন্মভূমির এই অল্পখ্যাত নদটি উপলক্ষ করিয়া কবি কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন।]

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত, (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়ামন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখ।

২। 'কপোতাক্ষ নদ' স্মৃতিতে কিভাবে ধরা পড়িয়াছে?

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—বিরলে, যেমতি, মায়ামন্ত্রধ্বনি, দুগ্ধ-স্রোতোরূপী, বঙ্গজ-জন।

৪। ব্যাখ্যা কর :— (ক) যেমতি লোক...........ভ্রান্তির ছলনে।
(খ) বহু দেশে...........জন্মভূমি-স্তনে।
(গ) প্রজারূপে রাজরূপ...........কর তুমি।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির অর্থ পরিস্ফুট কর :—এ বিরলে, এ স্নেহের তৃষ্ণা, সখা-রীতে, মজি প্রেমভাবে, বঙ্গের সঙ্গীতে।

৬। 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি মুখস্থ লিখ ও গদ্যে রূপান্তরিত কর।

৭। কপোতাক্ষ নদ, ব্রহ্মপুত্র নদ, গঙ্গা নদী, পদ্মা নদী—
এইরূপ বলা হয় কেন?

৮। নিম্নলিখিত পদগুলির গদ্যরূপ লিখ :— সতত; যেমতি; তব; মজি; রহিছে।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—স্রোতোরূপী, সঙ্গীত।

১০। তোমার বাড়ির নিকটে যে নদ বা নদী আছে তাহার সম্বন্ধে ৮।১০টি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।

সিদ্ধার্থের দয়া

নবীনচন্দ্র সেন

[সিদ্ধার্থ যে পরবর্তী জীবনে অহিংসা ও করুণার ধর্ম প্রচার করিবেন বাল্যের এই ঘটনা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। আহত রাজহংসটির প্রতি করুণায় তাঁহার অন্তর বিগলিত হইয়াছে। এই করুণার বশেই তিনি ভবিষ্যৎ-জীবনে সর্বজীবের দুঃখমোচনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন, হইবেন পরমকারুণিক বুদ্ধদেব।]

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমন;
শুক্ল মেঘখন্ড মত' রাজহংস শত শত
আনন্দলহরীপূর্ণ করিয়া গগন—
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহতবুকে
একটি কুমার অঙ্কে হইল পতন।
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে করুণার পরশনে
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল;
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত
চাহি' ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।

কি মহিমা করুণার! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান!
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া, কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ!

আসি দেবদত্ত কহে, "কুমার, এ হংস মম,
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিলা ধীরে, "হত জীব হত্যাকারী
পায় যদি, ভাই! কোনো ধর্মশাস্ত্রবলে,
যে দেয় জীবন তারে, সে কি তারে পাইবে না?
হত নহে, এই হংস, আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই, আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল!
তোমারো ত' আছে প্রাণ, পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি, যে ব্যথা পেয়েছে বিষম?
লও তুমি শাক্য রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা,
এ হংস আমার আমি দিব না কখন।"
শাক্যপুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত
দেখিল, কুমার নহে,—মূর্তি করুণার!
ফিরিল নীরবে গৃহে, উড়িল মরাল সুখে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

অনুশীলনী

১। অর্থ বল ঃ মনোহর, পুরোদ্যান, লহরী, অঙ্কে, প্রস্রবণ, মরাল, কানন, বিহঙ্গ, বিমোহিত, শর, স্তম্ভিত।

২। গদ্যরূপ লিখ ঃ নিরজন, যাইছে।

৩। 'সিদ্ধার্থের দয়া' কবিতায় যে কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৪। রাজহংসটি কাহার শরাঘাতে আহত হইয়াছিল? সিদ্ধার্থ তখন কোথায় বসিয়াছিলেন? তিনি হাঁসটিকে কী করিলেন?

৫। অর্থ বুঝাইয়া লিখ ঃ—

(ক) বিশ্বব্যাপী করুণার প্রস্রবণ। (খ) করুণার............বাঁচিল মরাল। (গ) যে দেয়.........পাইবে না? (ঘ) কুমার............মূর্তি করুণার।

৬। দেবদত্ত কেন রাজহংসটি দাবী করিয়াছিল? সিদ্ধার্থ তাঁহাকে কী বলিয়াছিলেন?

৭। 'সিদ্ধার্থের দয়া' কবিতা হইতে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের উক্তি-প্রত্যুক্তি তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৮। সিদ্ধার্থ পরবর্তী জীবনে কী নামে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন? তিনি কী ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন? সেই ধর্মের মূল কথা কি?

৯। আহত রাজহাঁসটিকে সিদ্ধার্থ যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কী আভাস পাওয়া যায়?

১০। ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) যাইছে.........প্রস্রবণ। (খ) যে দেয়............বিকল। (গ) শাক্য-পুত্রে.........প্রচার।

ব্যাকরণ ঃ

১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ— মনোহর, পুরোদ্যান, নীরব।

২। লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ—বিহঙ্গ, কুমার, মরাল, জননী।

৩। উপযুক্ত বিশেষণ বসাইয়া শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

——জননী। ——ব্যথা। —— —— চিত্ত।

৪। বাক্য রচনা কর ঃ—

স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিমোহিত, মনোহর, বিষম, কলকণ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি রথযাত্রার মেলার পটভূমিকায় সুখ ও দুঃখের দুইটি বিপরীত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রথের মেলায় এক পয়সায় একটি তালপাতার বাঁশি কিনিতে পারিয়া একটি শিশু আনন্দে উচ্ছল, আর একটি শিশু রাঙা লাঠি কিনিতে না পারিয়া বেদনায় কাতর। সুখের পাশাপাশি এই দুঃখের চিত্রটি থাকায়, শিশুর দুঃখবোধ আরও গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হল ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা
যত খুশি, যতই নেশা
সবার চেয়ে আনন্দময় ঐ মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি আনন্দ-স্বরে—
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে॥

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি লোকের নাহি শেষ।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মতো

ঐ যে ছেলে কাতর চোখে দোকান পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে, একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা নয়ন অরুণ—
হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।
২। রথযাত্রার মেলায় সুখ ও দুঃখের বিপরীত চিত্র দুটির বর্ণনা কর।
৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—
আনন্দময়, হর্ষধ্বনি, অবিশ্রান্ত, নিমেষহারা, অরুণ, করুণ।
৪। ব্যাখ্যা কর :— চেয়ে আছে নিমেষহারা............করেছে করুণ।
৫। বাক্যাংশগুলির অর্থ পরিস্ফুট কর :—
(ক) যতই নেশা। (খ) আনন্দ স্বরে। (গ) নিমেষহারা নয়ন অরুণ।
৬। টীকা লিখ :—স্নানযাত্রার মেলা; ঠাকুরবাড়ি।
৭। 'সুখ-দুঃখ' কবিতায় 'একটি পয়সা' কত মূল্যবান বুঝাইয়া দাও।
৮। বাক্য রচনা কর :— মেলামেশা; আনন্দময়; হর্ষধ্বনি; ঠেলাঠেলি; অবিশ্রান্ত; বৃষ্টিধারা; কাতর চোখে; নিমেষহারা; করুণ।
৯। কবিতাটি আবৃত্তি কর (প্রথমে একক ভাবে, পরে দুইটি স্তবক পৃথক ভাবে দুই জনে)।
১০। 'একটি মেলার দৃশ্য'—এই বিষয়ে ৮।১০ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

সুখ

কামিনী রায়

[মহিলা-কবি কামিনী রায়ের এই কবিতাটিতে একটি নীতিকথা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বার্থপরতায় যথার্থ সুখ নাই, পরহিত-ব্রতের মধ্যেই যথার্থ সুখ নিহিত—এই নীতিকথাটি আলোচ্য কবিতার উপজীব্য।]

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদনা আর;
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার?
পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অনুশীলনী

১। 'সুখ' কবিতাটি মুখস্থ লিখ ও গদ্যে পরিবর্তিত কর।
২। 'সুখ' কবিতাটির মধ্যে সুখী হইবার কি পথ-নির্দেশ আছে?
৩। কবিতাটির মূল ভাব সংক্ষেপে লিখ।

৪। ব্যাখ্যা কর :—(ক) পরের কারণে............ভুলিয়া যাও।
(খ) আপনারে লয়ে বিব্রত............পরের তরে।

৫। অর্থ লিখ :—পরের কারণে, হৃদয়-ভার, নয়ন-ধার, পরহিত-ব্রতে, বিষাদ-ভার, বিব্রত, অবনী।

৬। 'পরোপকার' বিষয়ে ৫টি স্বাধীন বাক্য রচনা কর।

৭। 'পরের কারণে মরণেও সুখ'—এই ভাবটি আছে এমন কোন ইতিহাসের কাহিনী জানা থাকিলে বল।

৮। 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—আমাদের সমাজ-জীবনে এই ভাব কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে?
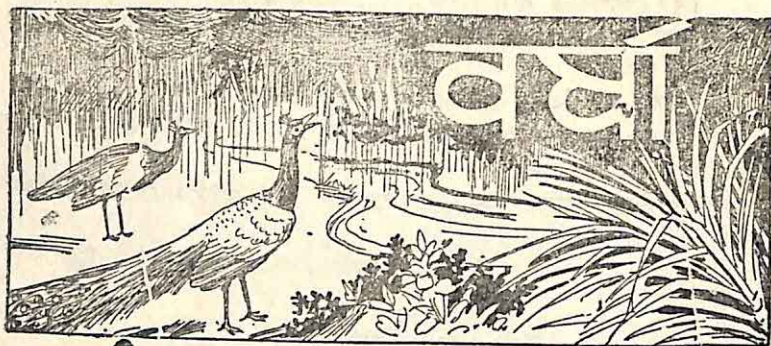
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কবিতাটিতে বর্ষার একটি রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।]

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে!
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই!

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে
বিশাল শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে ;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে
ভিজিয়ে দিল ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে!

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে!

ময়ূর বলে 'কে গো?' এ যে আকুল-করা রূপ!
ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়,' জগৎ রহে চুপ;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।

কোন্‌ মোহিনীর ওড়না সে আজ উঁড়িয়ে এনেছে
পূবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে;
চম্‌কে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস!

বাদল হাওয়ায় আজকে আমার পাগ্‌লি মেতেছে;
ছিন্নকাঁথা সূর্যশশীর সভায় পেতেছে!
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।

অনুশীলনী

১। বর্ষাকে পাগ্‌লি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে কেন?
২। বর্ষার বিচিত্র রূপের পরিচয় দাও।
৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—
পরিচ্ছন্ন, ঈশান কোণ, বজ্রহাত, মোহিনী, সংজ্ঞাহারা, দৃক্‌পাত।
৪। ব্যাখ্যা কর :—(ক) ঐ দেখ গো............আকাশ ঢেকেছে।
(খ) বজ্রহাতের হাততালি............নাচিয়ে দিয়ে যায়।
(গ) কোন মোহিনীর............অঙ্গে হেনেছে।
(ঘ) আপন মনে গান............সংজ্ঞাহারা রাত।
৫। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির তাৎপর্য পরিস্ফুট কর :—
(ক) চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।
(খ) ছিন্ন কাঁথা সূর্যশশীর সভায় পেতেছে।
(গ) মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত।
(ঘ) ময়ূর বলে 'কে গো'?
(ঙ) ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়'।
৬। ছন্দ ঠিক রাখিয়া কবিতাটি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি কর।

৭। 'বঙ্গে বর্ষা'—এই বিষয়ে ১০।১২ পংক্তির মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

৮। বজ্র, বিদ্যুৎ, হাওয়া, মেঘ, বৃষ্টি—এই সব কিছু লইয়াই যে বর্ষার সম্পূর্ণ চিত্র তাহা কোন্ কোন্ পংক্তির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে উল্লেখ কর।

৯। নিম্নলিখিত পদ বা পদসমষ্টির দ্বারা বাক্য রচনা কর। প্রত্যেকটি বাক্যে বর্ষার চিত্র ফুটিয়া উঠিবে।

পাগল মেঘ; ঈশান কোণ; খেয়ালের ঝোঁক; বজ্রহাতের হাততালি; চিকমিকিয়ে; আকুল করা; চোখের ধারা; কেয়ার রেণু; কদম ফুলের বাস; বাদল হাওয়া; ছিন্ন কাঁথা; মুগ্ধ; মৌন; সংজ্ঞাহারা।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের এই কবিতাটিতে মানব-স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষের স্বভাব ধর্ম। উপকারীর উপকার স্বীকার করার মধ্যেই মানবধর্ম নিহিত—এই কথাটিই আলোচ্য কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে।]

একদা পৌষের প্রাতে দুঃখে জীর্ণ শীর্ণকায়,
চলেছে পথিক এক, শীতে ঠেকে পায় পায়।
হেরিয়া কম্পিত পদ, হেরি ম্লান মুখখান,
চোখেতে আসিল জল, কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ।
ছেঁড়া বালাপোষখানি দিনু ডাকি' হাতে তা'র,
গায়েতে জড়া'লো সে'টি বহে দর দর ধার।
"যে শান্তি দিল এ দীনে",—বলে জুড়ি' দুটি কর
"যুগে যুগে সুখ শান্তি দিয়ো তাঁ'রে, হে ঈশ্বর!
যে করিল অভাগার এত শীত নিবারণ,
তাঁর দুঃখ-ব্যথা যেন ঘুচাইয়ো ভগবন্!"
কে বলে কৃতঘ্ন নরে? নহে তাহা সত্য কথা,
হায়, কত তুচ্ছ দানে কি গভীর কৃতজ্ঞতা!

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ লিখ ও গদ্যে পরিবর্তিত কর।
২। 'কৃতজ্ঞতা' কবিতাটির গল্পাংশ নিজের ভাষায় লিখ।
৩। 'কৃতজ্ঞতা' ও 'কৃতঘ্নতা'—উভয়ের পার্থক্য কি?
৪। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কে অধিকতর সুখী হইয়াছেন?
৫। ব্যাখ্যা কর :— কে বলে কৃতঘ্ন............কৃতজ্ঞতা।
৬। তাৎপর্য পরিস্ফুট কর :—'কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ', 'বহে দর দর ধার'।
৭। গদ্য রূপ লিখ :—হেরিয়া; হেরি; দিনু; বহে; মুখখান।
৮। বানান শিখ (প্রত্যেকটি শব্দ ৫ বার করিয়া লিখ) :—
জীর্ণ; শীর্ণকায়; প্রাণ; ব্যথা; নিবারণ।
৯। 'কৃতজ্ঞতা'র ভাব অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ভাবে একটি ছোট গল্প লিখ।
১০। 'কৃতঘ্নতা'—বিষয়ে ৫টি স্বাধীন বাক্য রচনা কর।

কাজী নজরুল ইসলাম

[এই কবিতাটিতে পল্লীপ্রধান বাংলা দেশের রূপচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ঋতুতে ঋতুতে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের নিসর্গপ্রকৃতির যে রূপবৈচিত্র্য তাহারই একটি সজীব চিত্র এখানে পাওয়া যায়।]

এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী!
ফুলে ও ফসলে কাদা-মাটি জলে ঝলমল করে লাবণি॥

রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম-কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি॥

কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চল বালিকা।
তড়াগ পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী॥

শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়িখানি পরো আগমনী গান গাহিয়া,
অঘ্রাণে মাগো, আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরো অবনী॥

শীতের শূন্য মাঠে ফের তুমি উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে, কীর্তন শোন রাতে মা,
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে বিভিন্ন ঋতুতে পল্লী-জননীর যে শোভা বর্ণিত হইয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—

অপরূপ, লাবণি, রৌদ্রতপ্ত, ঝঞ্ঝা, প্রান্তর, অশনি, মালিকা, তড়াগ, সুঘ্রাণ, অবনী, উদাসী, ধরণী, নিখিল।

৩। ব্যাখ্যা কর :—(ক) ঝঞ্ঝার সাথে............লয়ে অশনি।

(খ) শাপলা শালুকে............ভরো অবনী।

(গ) শীতের শূন্য মাঠে............নিখিল ধরণী।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও :—

চাতকের সাথে চাহ জল; জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল; খেল লয়ে অশনি; বর্ষায় গাঁথ মালিকা; খেল চঞ্চলা বালিকা; শ্যামল শোভার নবনী; আগমনী গান গাহিয়া; উদাসী বাউল সাথে।

৫। টীকা লিখ :—আগমনী গান; আমন ধান; উদাসী বাউল; ভাটিয়ালি: কীর্তন; আবীর।

৬। পল্লীজননীর চিত্র পরিস্ফুট করিয়া বাক্য রচনা কর :—অপরূপ; ঝলমল; লাবণি; রৌদ্রতপ্ত; মধুর গন্ধ; ঝঞ্ঝা; অশনি; অবিরল; চঞ্চলা; থই থই; শ্যামল শোভা; শিশির; সুঘ্রাণ; উদাসী; আবীর।

৭। গদ্য রূপ লিখ :—হেরিনু; চাহ; নাহিয়া; রাঙাও।

৮। বানান শিখ (প্রত্যেকটি শব্দ ৫ বার করিয়া লিখিবে)। অপরূপ; লাবণি; জ্যৈষ্ঠ; অশনি; যূথিকা; নবনী; অঘ্রাণ; সুঘ্রাণ; অবনী; শূন্য; উদাসী; কীর্তন; ধরণী।

৯। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া লিখ ও আবৃত্তি কর।

১০। 'গ্রাম বাংলা'—এই বিষয় অবলম্বন করিয়া ১০।১২ লাইনের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

নগরলক্ষ্মী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অতীত ভারতের জীবন-ইতিহাসের অসংখ্য ছোট ছোট আপাত-তুচ্ছ ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে ত্যাগ, ক্ষমা, বীরধর্ম ও মানব-মহত্ত্বের অন্যান্য যে সব গুণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লইয়া রবীন্দ্রনাথের "কথা" কাব্যগ্রন্থ রচিত। "নগরলক্ষ্মী" এই কাহিনীমূলক কবিতাটি 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। বুদ্ধদেবের অনুরোধে দুর্গতজনের সেবা করিতে যখন বিত্তবান বুদ্ধ-শিষ্যগণ আপন আপন অক্ষমতা জানাইয়াছিল, তখন বুদ্ধশিষ্যা সুপ্রিয়া নিজে ভিক্ষুণী হওয়া সত্ত্বেও সে দায়িত্ব পালনে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। কোন মহৎ কর্মযজ্ঞে সাধ্যটি বড় কথা নয়, সাধই বড় কথা—এই বক্তব্যই কবিতাটির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে।]

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
'ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?'

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে করজুড়ি 'ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী!'

কহিলা সামন্ত জয়সেন
'যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হত কোন কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ!'

নিশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল
'কি কব এমন দগ্ধ ভাল,
আমার সোনার খেত শুষিছে অজন্মা প্রেত,
রাজকর জোগানো কঠিন—
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।'

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদ-সুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা
নগরীর অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।'

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
'ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী!
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এহেন কঠিন গুরু কাজ!
কি আছে তোমার কহো আজ।'

আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
কহিল সে নমি সবা-কাছে
'শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

অনুশীলনী

১। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটির গল্পাংশ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বুদ্ধদেবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া ভক্তদের মধ্যে কে কি বলিয়াছিলেন?

৩। নিজে ভিক্ষুণী হওয়া সত্ত্বেও সুপ্রিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা পালনে সম্মত হইয়াছিল কেন ও কোন্ যুক্তিতে?

৪। কবিতাটির মূল ভাবের পরিচয় দাও।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—
দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধার্ত, অজস্মা, রাজকর, লাজনম্রশির, অনাথপিণ্ডদসুতা, অশ্রুপ্লুতা।

৬। ব্যাখ্যা কর :—(ক) বুদ্ধের করুণ আঁখি............রহে ফুটি।
(খ) আমার ভাণ্ডার............ঘরে ঘরে।

৭। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির তাৎপর্য পরিস্ফুট কর :—
(ক) ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী। (খ) শুষিছে অজস্মা প্রেত। (গ) রহে সবে মুখে মুখে চাহি। (ঘ) ব্যথিত নগরী 'পরে। (ঙ) রক্তভাল লাজনম্রশিরে। (চ) আমার সন্তান তারা।

৮। গদ্য রূপ লিখ :—
শুধালেন; করিছেন; নিশ্বাসিয়া; কব; শুষিছে; তব; আজি; নমি; তোমা সবাকার।

৯। নিম্নলিখিত ভাবগুলি কোন্ কোন্ পংক্তিতে আছে বল :—

(ক) বুদ্ধদেবের এক ভক্ত শেঠ শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষ দূর করিবার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিল না।

(খ) বুকের রক্ত দিতে পারি, কিন্তু অন্ন দিতে পারি না।

(গ) দয়ায় ভরা দুটি চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

(ঘ) যে নারী ক্ষুধার্ত জনগণকে নিজের সন্তান মনে করেন তিনিই তাহাদের ক্ষুধা দূর করিতে পারেন।

(ঙ) যে ভক্ত শিষ্য যথার্থ ভিক্ষু তাহার ভিক্ষার অভাব হয় না।

১০। তোমার দেশে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, আর তোমার দেশের রাষ্ট্রপতি যদি ঐ দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন তখন তুমি কিভাবে ঐ আবেদনে সাড়া দিবে ৮।১০ লাইনের মধ্যে লিখিয়া প্রকাশ কর।

হঠাৎ যদি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[প্রেমেন্দ্র মিত্র খ্যাতিমান আধুনিক কবি। এই কবিতায় তিনি চিরকালীন শিশুচিত্তের অবাধ কল্পনাকে মুক্তি দিয়াছেন। শিশুর নিকট অসম্ভব অবাস্তব বলিয়া কিছু নাই। বরং যাহা কিছু পরিচিত ও পুরাতন তাহার প্রতি রহিয়াছে অনাগ্রহ। তাই দেখি, এই কবিতায় শিশুটি নানা বিধি-নিষেধ-ঘেরা মানুষের সভ্য জগৎ ছাড়িয়া প্রাকৃতিক বিশ্বে অসম্ভব আধিপত্য করিতে চাহিয়াছে।]

আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটা কয়েক আইন জারি
দু এক জনায় খুব ক'ষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি-ফোঁটায় ফেলি চিকন চিক্,
ঝুলিয়ে ঝামর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই,
বাজগুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাওয়ায় বলি হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিবিয়ে দলে দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধ'রে খুব ক'ষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা;
মনের মত কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব করে নিই ঘটা।
সত্য তা সে যতই বড় হ'ক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে।
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

অনুশীলনী

১। অর্থ বল : চিক্, বাজ, মানা, ঘটা, জারি।

২। 'হঠাৎ যদি' কবিতায় কবির অন্তরে যে সকল ইচ্ছা জাগিয়াছে সেগুলি বর্ণনা কর।

৩। হঠাৎ যদি তোমাকে এক রাত্রির জন্য রাজা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তুমি কী কী কাজ করিবে, এই কবিতার অনুসরণে তাহা লিখ।

৪। 'হঠাৎ যদি' কবিতায় যে সকল অসম্ভব ইচ্ছার কথা বলা হইয়াছে সেগুলি আসলে কাহার? কবির, না সকল দেশের সকল শিশুর?

৫। 'হঠাৎ যদি' কবিতায় কবি মেঘ, বৃষ্টি, বাজ ও হাওয়াকে কী কী হুকুম করিবেন?

৬। এই লাইন কয়টির অর্থ বুঝাইয়া বল :—

(ক) বৃষ্টি ফোঁটার চিকন চিক্। (খ) বাজগুলো.........রাজা। (গ) তারার.........দল। (ঘ) ওলট.........বিশ্বখানা। (ঙ) ভাঙি.........মানা।

৭। 'হঠাৎ যদি' কবিতায় কবি শিশু-চিত্তের অবাধ কল্পনার বর্ণনা করিয়াছেন। মন্তব্যটি বুঝাইয়া বল।

৮। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) বৃষ্টি ফোঁটায়.........বাজা। (খ) হাওয়ার...........দেশে।
(গ) ওলট...........ঘটা। (ঘ) সত্য তা...........সাজা।